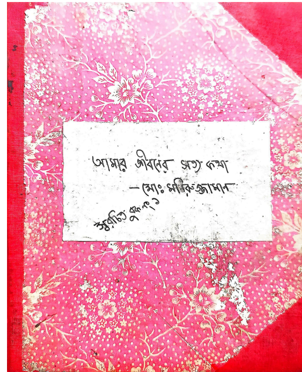
মোঃ মনিরুজ্জামান (মনির)

আমার জীবনের সত্য কথা

First published by মোঃ মনিরুজ্জামান (মনির) 1991

First edition



উৎসর্গ

- আমার "মা" কে

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর
লও যত লৌহ লৌষ্ট্র কাঠ ও প্রস্তর।
হে নব সভ্যতা। হে নিষ্ঠূর সর্বাগ্রাসী।
দাও সে তপবন পূর্ণ ছায়া রাশি–

অজ্ঞাত

Contents

ভূমিকা

অবশেষে অনেক কষ্ট সহ্যের পর “আমার জীবনের সত্য কথা” বইটি বের করতে সমর্থ্য হলাম। সঙ্গত কারনে বইটির প্রথম মুদ্রন হাতের লেখার মাধ্যমে বের করলাম। লেখার বিষয়ে যদি কোন ত্রুটি হয় তাহলে আমাকে মাফ করে দেবেন।

এই বইটি লেখার পিছনে আমার সময় ব্যায় হয়ছে ৩০ ঘন্টা। তবে এক নাগারে নয়। এই স্বল্প সময়ে আমাকে লিখতে হয়েছে ৬৫ দিনের ঘটনা। আর এই বইটি লেখার সময় আমার বয়স ১৬ বছর এবং দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং এই বইটি পড়ার আমন্ত্রন জানিয়ে ভূমিকা এখানেই শেষ করছি।

– মোঃ মনিরুজ্জামান (মনির)

৩০–০৮–১৯৯১

বিঃদ্রঃ- এই লেখাটিতে অনেক ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে। কারণ, আমি কোন লেখক নই। বিখ্যাত লেখকের মতো লিখতেও পারি না। লেখায় বহু ভুল-ত্রুটি হয়েছে বলে ক্ষমা চাই।

1

শুরু আগে কিছু কথা

পৃথিবীর কথা বাদই দিলাম, বাংলাদেশের একজন নাগরিক হয়ে এ দেশ সম্পর্কে আমরা কে কতটুকুই বা জানি। এ দেশ সম্পর্কে জানার হয়তো কারও ইচ্ছা আছে, হয়তো কারও নাই। কারও আবার ইচ্ছা আছে সুযোগ নাই। হয়তো কারও কারও ইচ্ছা ও সুযোগ দুটোই আছে। আমার এই দেশ সম্পর্কে জানার একটা তীব্র ইচ্ছা ছিল এবং আছে। কিন্তু সুযোগ পায়নি কোন দিন। আমি সব সময় সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। আমার আশা ছিল একদিন আমি ঠিকই সুযোগ পেয়ে যাব। আমার এই প্রচন্ড শক্তিশালী ছিল বলেই একদিন এই আশা সত্যিতে রুপান্তরিত হলো। অর্থাৎ আমি এদেশ সম্পর্কে জানার একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবো বলে আমি সুযোগ পাওয়ার সাথে সাথেই সিদ্ধান্ত নিলাম। জানি না আমার এই সিদ্ধান্ত ঠিক না ভূল হয়েছিল। হয়তো ভূল নয়তো নির্ভূল। থাক আর ভূমিকা বাড়িরে কোন লাভ নেই। কারন ভূমিকা দিয়ে তো আর লেখাটা শেষ করতে পারবো না। ভূমিকার সাথে দরকার বিস্তারিত বিবরণেরও। দেখি এমন কিছু বিবরন আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারি কিনা, যাতে আপনারা একটু আনন্দ পেতে পারেন। কোন ত্রুটি হলে বিশেষ করে লেখার বিষয়ে তাহলে মাফ করে দেবেন। কারন আমি কোন কবি নই যে,

ভাল ভাবে নিজের ভাব লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবো। এবার তাহলে আপনাদের অনুমতি নিয়ে মূল ঘটনা শুরু করি।

2

শুরুটা হলো যেভাবে

সেদিন ছিল ১৭ই জুলাই ১৯৮৯। সকাল বেলা হতেই দিনটা আমার পক্ষে ছিল। সকাল ৬টায় ঘুম থেকে উঠলাম। তারপর হাত-মুখ পরিষ্কার করে রীতি মতো পড়তেও বসলাম। কিন্তু পড়ায় মোটেও মন বসছিল না। মাথায় পূর্বের সেই চিন্তাটি বারবার ঘুরপাক খাচ্ছিল। ঘুরপাক খেতে খেতে চিন্তাটি এক সময় এমন এক স্থানে গিয়ে পোঁছাল যে, সেখান থেকে চিন্তাটি আর ফিরিয়ে আনতে পারলাম না। তাই নিতান্ত বাধ্য হয়েই আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হলো আজই আমার সেই আশাটিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে হবে। আমি এর জন্য সম্ভব সব রকম প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। তারপর কয়েকটা ঘণ্টা আমার নিজের অজান্তে কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেল। একটা কথা বলতে তো ভুলেই গেছি, যখন এই ঘটনার শুরু হয় তখন আমি পিতা-মাতা সহ মাগুরা সদরে বাস করি। আর তখন আমার বয়স ১৪ বছর এবং ৮ম শ্রেণীর ছাত্র। এখন মূল ঘটনায় আবার ফিরে আসা যাক।

স্কুল সেদিন কি কারণে যেন বদ্ধ ছিল। বেলা তখন আনুমানিক ১২টা ৩০মিঃ। সম্ভবত আমার দেশ দেখার বা ভ্রমণের কোন কাজের জন্য আমি আমার পড়ার রুমে ঢুকেছিলাম। আমার পড়ার রুমেই ছিল আমাদের পরিবারের একটা আলমারি। আমি জানতাম ঐ আলমারিতে প্রায়ই টাকা থাকে। সঙ্গত কারণেই আমার নজর আলমারির উপরে পড়লো। আলমারির

দিকে চেয়ে দেখি আলমারি খোলা। আমি আশায় বুক বেঁধে আলমারির আরও কাছে গেলাম। আল্লাহ্ আমার প্রতি সহায় হলেন। দেখলাম অনেক টাকা। আনুমানিক ১১০০-১২০০(১৯৮৯ সাল) টাকা। আমার বুকের ভিতর তখন প্রাচীন দিল্লীর রাজ-প্রাসাদের ঘণ্টা বাজা শুরু করে দিয়েছে। আমি বেশী দেরী না করে ওখান থেকে ৩০০ টাকা নিয়ে পকেটে গুঁজলাম। তারপর আলমারির দরজা দুটো ভিজিয়ে পড়ার চেয়ারে এসে বসলাম। একটা বই খুলে নিয়ে পড়তে শুরু করে দিলাম। মন দিয়ে পড়া তো না। একেবারে স্রেফ লোক দেখান পড়া। মা-বাবা যাতে সন্দেহ না করে তার জন্য এই ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পর যখন ভাবলাম এখন আর আমাকে কেউ সন্দেহ করবে না তখন চেয়ার থেকে উঠলাম।

আমরা ছিলাম তিন ভাই। বাবা সখ করে আমাদের তিন ভাইকে একটা সাইকেল কিনে দিয়েছিলেন। পরিবারের বড় ছেলে বলে সাইকেলের উপর আমারই বেশী অগ্রাধিকার ছিল। সাইকেলের চাবিটা সব সময় আমার কাছেই থাকতো। সাইকেলের চাবিটা নিয়ে সদর দরজার কাছে এলাম। সদর দরজায় এসে দেখি বাবা বসে রয়েছেন। আমি মনে মনে যাই সন্দেহ করেছিলাম তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

"এই ভর দুপুরে কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?" তিনিই আমাকে প্রশ্ন বললেন।

"কোথাও না, এই দীপুদের বাসায়। দীপুর সাথে আমার কিছু কথা আছে।" আমি ওনার উত্তরে বললাম। ভাবলাম বাবা আরও কিছু প্রশ্ন করবেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। আমিও কোন মতো বেঁচে গেলাম। চাবিটা নিয়ে সাইকেলটা খুলে বাসা থেকে বের হয়ে পড়লাম। আমাদের বাসাটা ছিল তখন কলেজ পাড়ায়। যখন আমি বাসা থেকে বের হলাম তখন আমার সম্বল ছিল :- একটা লুঙ্গি, এক জোড়া স্যান্ডেল, একটি ফুল হাতা শার্ট, ৩০০ টাকা, একটি ঘড়ি আর একটি হিরো রয়্যাল সাইকেল। অর্থাৎ সর্বমোট যার মূল্য হতে পারে ২৫০০টাকা। কলেজ পাড়া থেকে প্রথমে সাইকেল চালিয়ে ভায়না মোরে এলাম। দীপুদের বাসাটা ছিল পুলিস লাইনয়ে।

আমার এই বিদায় বেলায় দীপুকে দেখতে খুবই ইচ্ছা করছিল। কারণ দীপু আমার বন্ধুদের ভিতর সবচেয়ে প্রিয়। তাই দীপুদের বাসার দিকে রওনা দিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, দীপুদের বাসায় পৌঁছে শুনি দীপু বাসায় নাই। কি একটা কাছে বাইরে গেছে। অগত্যা ওর সাথে দেখা না করেই আমাকে বিদায় নিতে হলো। আমি মাগুরা শহরকে ধন্যবাদ জানিয়ে দেশ ভ্রমণের উদ্দেশে বের হয়ে পড়লাম।

3

ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা

মাগুরা শহর হতে দুইটি বড় শহরের দিকে যাওয়া যায়। একটি হলো খুলনা, অপরটি হলো ঢাকা। যেহেতু ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী, সেহেতু ঢাকার উদ্দেশেই রওনা হলাম। সাইকেল চালিয়ে ঢাকা রোডে এসে পৌঁছলাম। কিন্তু ঢাকা রোড থেকে গাড়িতে চরলাম না। কারণ এখান থেকে গাড়িতে চরলে হয়তো পরিচিত কেউ দেখে ফেলবে। তাই ঢাকা রোড হতে আরও উত্তরে যেতে লাগলাম। মাঝে মাঝে থেমে বাসের উদ্দেশ্যে হাতও তুলেছি। কিন্তু কোন বাস থামেনি। তাই বাসের উপর এক রকম রাগ করেই বাসের উদ্দেশ্যে আর হাত তুললাম না। এক মনে সাইকেলে প্যাডেল দিতে লাগলাম। প্যাডেল দিতে দিতে প্রায় ৫/৬ মাইল এসে গেছি। আর কিছুদূর পরেই কামার-খালী ফেরী ঘাট। তাই আরও জোড়ে জোড়ে সাইকেলে প্যাডেল দিতে লাগলাম। ঘন ঘন প্যাডেল দিতে দিতে এক সময় কামার-খালী পৌঁছে গেলাম। এবার একটু স্বস্থিবোধ করতে লাগলাম। কারণ এবার নিশ্চয়ই বাস পাব। সাইকেল নিয়ে ঘাটে ভিড়ানো একটা ফেরীতে চড়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পর একের পর এক বাস ফেরীতে উঠতে লাগল। মনের মতো একটা বাস পেয়ে ফরিদপুরে যাবার ভাড়া ঠিক করে তাতে চড়ে বসলাম। আমি দেখলাম আমার যত ভাড়া লেগেছে সাইকেলেরও তত ভাড়া লেগেছে। এই প্রথম বারের মতো আমি বুঝতে পারলাম সাইকেলটা আমার জন্য অতিরিক্ত বোঝা। বাসের

আরামদায়ক সিটে বসে চলে এলাম ফরিদপুরে। বেলা তখন ৩টা। ফরিদপুরে কিছু খেয়ে-দেয়ে মিনিবাস যোগে চলে এলাম দৌলতদিয়া ফেরী ঘাটে।

"ওদিকে যাবেন না।" মিনিবাস থেকে নামার সময় গাড়ির হেলপার আমাকে বললেন।

"কেন?" আমি জানতে চাইলাম।

- "ফেরীতে পুলিস রয়েছে। তারা চোরাই মাল ধরছে। আপনার সাইকেল যেহেতু ভারতের সেহেতু আপনাকে ধরতে পারে।"

আমি তার কথা বিশ্বাস করলাম। তবুও সচক্ষে দেখার জন্য ফেরী ঘাটেও গেলাম। গিয়ে দেখি সত্যি তাই। পুলিস সেখানে রয়েছে। এক একটা গাড়ি ফেরীতে উঠছে আর পুলিশ গাড়ির ভিতরে বসা যাত্রীদের চেক করছে। সুতরাং আমি আর ওদিকে পা না বাড়িয়ে যে দিক থেকে এসে ছিলাম, সেই দিকে রওনা হলাম। আর ভাবতে লাগলাম, এখন উপায় হবে কি? নৌকায় হয়তো নদীটা পার হতে পারবো। কিন্তু সাইকেল শুদ্ধ নৌকায় নেবে তো। তার উপর আবার ভারতের সাইকেল। যদিও বা নেয় ভাড়া নিশ্চয়ই বেশী চাইবে। এই সব আবোল-তাবোল কথা ভাবতে ভাবতে চলতে লাগলাম। মাঝে মাঝে নোকার মাঝিদেরকে জিজ্ঞেস করতেও দ্বিধা-বোধ করিনি। কিন্তু তারা কেউ ওপারে যেতে চাইলো না। তাই আমি প্রায় আশা ছেড়ে দিলাম। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে যখন বাসষ্ট্যান্ডে এলাম তখন দেখলাম কিছু দুরে একটা লঞ্চ রয়েছে। লঞ্চটা নদীর তীরে ভেড়ানো। লোকজন অনেকেই সেই লঞ্চের দিকে যাচ্ছে। আমি শেষ চেষ্টা নেয়ার জন্য লঞ্চের দিকে গেলাম। আল্লাহ্ এবার আমার প্রতি সহায় হলেন। আমিও লঞ্চে চড়ার সুযোগ পেলাম। কিন্তু ভাড়া চাইলো ডবল। কারণ সেই একই, সাইকেল। তাই ভাড়া ডবল দিয়েই রওনা দিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। লঞ্চ তার গতিতে গন্তব্য স্থান অর্থাৎ আরিচা ঘাটের উদ্দেশ্যে চলতে লাগলো। লোকজনেরও কাছে জানতে পারলাম আরিচা ঘাটে যেতে প্রায় ১ঘন্টা সময় লাগবে। তাই কম হলেও কিছু সময় হাতে পেলাম। আজ সুন্দর পূর্ণ গোল একটা চাঁদ উঠেছে। লঞ্চ থেকে চাঁদটাকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল। চাদের আলো নদীতে পড়ায় নদীকেও

সুন্দর লাগছিল। চাঁদ সম্পর্কে এরকম অভিজ্ঞতা এই আমার প্রথম হলো। চাঁদ যে এত সুন্দর হতে পারে তা আগে আমার জানা ছিল না। আমার মনে হলো চাঁদ আমাকে, আমার এই ভ্রমণকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

এই সময়ে হটাৎ আমার বাসার কথা মনে পড়ে গলো। বাবা এতক্ষণে হয়তো খোঁজা-খোঁজি শুরু করে দিয়েছেন। হয়তো মা বাসায় বসে অপেক্ষা করছেন আমি ওনার কাছে কখন ফিরে যাব। বাবা হয়তো কতক্ষণ খোঁজা-খোঁজির পর বাসায় ফিরছেন। ওনার আশা, ফিরেই হয়তো দেখতে পাবেন আমাকে। যখন দেখবেন আমি বাসাই নাই, তখন হয়তো খুবই চিন্তিত হয়ে পড়বেন। মা হয়তো এতক্ষণে কান্না-কাটিও শুরু করে দিয়েছেন। আর ভাবতে পারলাম না। বলতে গেলে ইচ্ছা করেই ভাবনাটা মন থেকে মুছে ফেললাম। এই সব চিন্তা করলে হয়তো আমার দেশ ভ্রমণ আনন্দ-দায়ক হবে না।

ধীরে ধীরে গড়িয়ে গেল পুরো একটা ঘণ্টা। টেরও পেলাম না, সময় যেন হাওয়া হয়ে গেল। লঞ্চ আরিচা ঘাটে এসে থামল। মনে মনে খুশী বোধ করতে লাগলাম। কারণ শেষ পর্যন্ত আরিচা ঘাটে পৌঁছাতে পারলাম। সাইকেল নিয়ে লঞ্চ থেকে নামলাম। তারপর চলে এলাম আরিচা বাস স্ট্যান্ডে। সেখান থেকে একটা মিনি বাসে চড়ে চলে এলাম গাবতলি। মিনি বাসটিও ডবল ভাড়া নিলো।

4

ঢাকা এক আলাদা শহর

গাবতলি যখন পৌঁছলাম তখন সময় রাত ৯টা। সাইকেল চালিয়ে কিছুদূর এগিয়ে দেখলাম এক তলা হোটেল। আমি সাইকেল নিচে তালা দিয়ে রেখে দোতলায় গেলাম। দোতলায় ম্যানেজার বসে ছিল।

– "এখানে কি রাত্রে থাকার কোন জায়গা আছে?" আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

– "আছে।" তিনি উত্তর দিলেন।

– "সাথে সাইকেল রয়েছে।"

– "অসুবিধা নেই।"

– "এক রুম কত?"

– "৪৭ টাকা।"

আমি আর কথা না বারিয়ে সাইকেল উপরে নিয়ে এলাম। তারপর ৪৭ টাকা দিয়ে একটা রুমের চাবি নিলাম। চাবি দিয়ে রুমটা খুলে ফেলে সাইকেল ভিতরে নিয়ে এলাম। রুমের ভিতরে নজর বুলিয়ে দেখলাম, এক পাশে একটা সিঙ্গেল খাট, আর অপর পাশে রয়েছে একটা টেবিল। টেবিলের উপর স্বজনতে জগ আর গ্লাস সাজানো আছে। তার মধ্যে জগটা ছিল পানি ভর্তি। আমার পেটে তখন দারুণ খিদে ছিল। তাই রুমে তালা দিয়ে আবার

ম্যানেজারের কাছে এলাম। ম্যানেজার মাথা নিচু করে কি একটা কাজ করছিলেন। আমাকে কথা বলতে শূনেই মাথা তুললেন।

– "আপনাদের এখানে কোন খাবার ব্যবস্থা আছে?" আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম।

– "নাই, তবে কিছুদূর গেলে হোটেল পেয়ে যাবে।" তিনি উত্তরে বললেন।

এই বলে তিনি আবার কাজ করতে শুরু করে দিলেন। আমি আর ওনাকে বিরক্ত না করে ওখান থেকে চলে এলাম। ঠিক করলাম এখন আর হোটেলে খেতে যাবো না। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে খাওয়া যাবে। এই ভেবে আবার রুমে চলে এলাম। জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢেলে পর পর দুই গ্লাস পানি খেয়ে নিলাম।। তারপর বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিলাম। এমনিতেই দিনের অর্ধেকটা সময় ব্যয় হয়েছে যাতায়াতে। তাই শরীরটা ছিল খুবই ক্লান্ত এবং খুব অল্প সময়েই আধমরা হয়ে(ঘুমিয়ে) গেলাম।

যখন ঘুম থেকে উঠলাম তখন সময় সকাল ৬টা ৩০মিঃ। আমি বাথরুমে ঢুককে কিছু কাজ সমাধা করলাম। তারপর হাতের আঙ্গুল দিয়ে কোন মতে দাঁত মাজার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলাম। যখন মনে করলাম দাঁত অন্তত কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে, তখন মুখ মণ্ডলে পানি ছিটিয়ে বাথরুম থেকে বেড়িরে এলাম। আমার হোটেলে থাকা এখন নিষ্প্রয়োজন। তাই হোটেল থেকে আমার জিনিস পত্র নিয়ে বের হয়ে এলাম।

আমি তখন ঢাকা শহরের অভ্যন্তরে রয়েছি। ঢাকার রাস্তা ছিল এক দম ফাঁকা। সেই ফাঁকা রাস্তায় কতক্ষণ সাইকেল চালালাম। যখন রাস্তা আমার মতো ছেলের চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়লো, তখন সাইকেল চালানো বন্ধ করলাম। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম ৮টা বাজে। আমার ঘড়িটা এই অসময়ে ভাল উপকার করেছিলো। সে ঠিক ঠিক সময়ে আমাকে সঠিক সময় জানান দিচ্ছিল।

আমার ছিল ক্ষুধার্ত পেট। তার উপর অনেকক্ষণ ধরে সাইকেল চালিয়োর ফলে আরও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। আমার তখনকার প্রয়োজন ছিল পেটে

কিছু দেয়া। তাই নিকটস্থ একটা একতলা হোটেলে ঢুকলাম। হোটেলের বেয়ারাকে ডেকে ৪টা পরাটা আর এক প্লেট ভাঁজি দিতে বললাম। বেয়ারা খাবার দিতে গেল। আমি খেয়ে-দেয়ে হোটেল ম্যানেজারের কাছে উপস্থিত হলাম। ম্যানেজার কলিং বেল টিপলেন। সাথ সাথে কোথা থেকে যেন একটা স্বর ভেসে এলো, "সাত টাকা।"

পরে লক্ষ্য করলাম আমাকে যে বেয়ারা খাবার পরিবেশন করেছে এ কণ্ঠস্বর তার। আমি যখন ম্যানেজারকে টাকা দিতে যাব, ঠিক তখন কে যেন বলে উঠলো, "আরও ১টা টাকা বেশী দাও।" আমি লোকটাকে চিনলাম না। আগে কখনও দেখেছি বলেও মনে হয় না। তাই তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কেন আপনাকে ১টা টাকা বেশী দিতে যাব?"

- "এমনি, একটা চা খাব।"

লোকটির চেহারা ছিল কিছুটা স্বাভাবিক মানুষের হতে বিন্ন রকমের। তাছাড়া আমার ১টা টাকার জন্য কোন ফ্যাসাদে যেতে ইচ্ছা করল না। তাই অতিরিক্ত ১ টাকা সহ মোট ৮ টাকা দিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলাম।

আমার হাতে রয়েছে তখন মাত্র ১০০ টাকা। ভাবতে লাগলাম এই ১০০ টাকা দিয়ে আর কয়দিনই বা চলবে। এর ভিতরে কোনো একটা উপায় বের করতেই হবে। তা নইলে দফা-রফা শেষ। আমি রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালাচ্ছি(রাস্তার পাশ দিয়ে) আর এই সব চিন্তা ভাবনা করছি। হঠাৎ আমার চোখ পড়লো সামনের দিকে। সামনের দৃশ্য দেখে আমি তো একেবারে হতবাক। যে জিনিস টা দেখলাম তা হলো বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা। তবে এটা আসল শাপলা না। সিমেন্টের তৈরি নকল শাপলা। যার চারদিকে পানির ফোয়ারা আছে। আমি নকল শাপলাটাকে দেখছি আর সাইকেল চালাচ্ছই। এমন সময় কারও সাইকেলের বা রিকশা টায়ার ব্লাস্ট হওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। আমি ভাবতেই পারিনি যে, আমার সাইকেলের টায়ারই ব্লাস্ট হয়েছে। নির্বিঘ্নে সাইকেল চালিয়ে যেতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর যখন একটা ছোট ইটের খোয়ার উপর দিয়ে সাইকেলের ব্লাস্ট হয়ে যাওয়া টায়ারটি গেল, তখন বুজতে পারলাম আমারই সাইকেলের টায়ার ব্লাস্ট হয়েছে। সাথে সাথে

নেমে পড়লাম সাইকেলের আরামদায়ক সিট থেকে। আমার অল্প কিছু দূরেই তখন নকল শাপলাটা রয়েছে। এখন কি করব, কিছু ভেবে না পেয়ে নকল শাপলাটার কাছে গেলাম তার সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে। পরে জানতে পারলাম স্থানটির নাম শাপলা চত্বর। শাপলা চত্বরের পাশেই একটা ব্যাংক রয়েছে। ব্যাংকটার নাম অবশ্য মনে পড়ছে না। সে যাই হোক, সাইকেলটা ব্যাংকের পাশে তালা দিয়ে রেখে ব্যাংকের মোজাইক করা সিঁড়ির এক পাশে বসে পড়লাম। সেখান থেকেও সিমেন্টের তৈরি শাপলাটাকে দেখা যাচ্ছিল।

5

চোরাই সাইকেল

আমি শাপলাটাকে দেখছি আর ভবিষ্যতের কথা ভাবছি। এক সময়ে মন স্থির করে ফেললাম, আজই সাইকেলটা বিক্রি করে ফেলব। কিন্তু ক্রেতা পাব কোথায়? আমার পাশে আমার চেয়ে বয়সে কিছুটা বসে ছিল।

আমি তাকে বললাম,

– "ভাই আমি খুব বিপদে পড়েছি। এই সময়ে আমি যদি আমার সাইকেলটা বিক্রি করতে পারি তাহলে হয়তো কিছুটা বিপদ মুক্ত হতে পারবো। আপনি কি আমার সাইকেলটা বিক্রি করার একটা বন্দোবস্ত করে দিতে পারবেন? যদি পারেন তাহলে আমার খুব উপকার হয়।"

তিনি বললেন,

– " তাই নাকি! দেখি তোমার কোন উপকারে আসতে পারি নাকি।"

এই বলে সে কোথায় যেন চলে গেল। যাওয়ার আগে বিড় বিড় করে কি যেন বলে গেল। যার বিন্দু বিসর্গও আমি বুঝতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পর সে তিন–চারজন লোক নিয়ে হাজির হল।

আমাকে উদ্দেশ্য করে তাদেরকে সে বলতে লাগলো,

– "এই যে, এই ছেলেটা সাইকেল বিক্রি করতে চাই।"

লোকগুলার মধ্য থেকে একজন সরাসরি আমাকে জিজ্ঞাশা করলেন,

– "তোমার সাইকেলের দাম কত?"

আমি ব্যাবসায়ী লকের মতো বলতে লাগলাম,

– “নতুন সাইকেল, দাম আর কি বলবো। যে দামে কেনা তার থেকে তিন–চারশো টাকা কম দিয়েন। কেনা হল ২০০০ টাকায়, ১৬০০ টাকা দেন।”

লোকটি বললেন,

– “চোরাই মালের দাম ১৬০০ টাকা! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে খোকা।”

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। লোকগুলো বলে কি, আমার সাইকেল চোরাই মাল।

আমি বললাম,

– “কি জাতা বকছেন আপনি, এটা চোরাই মাল হতে যাবে কেন।”

– “তুমি বেশী বারাবারি করো না তাহলে ফল খারাপ হবে। আমি বলছি তুমি সাইকেল খানা ৩০০ টাকায় দিয়ে দাও।”

– “২০০০ টাকার সাইকেল ৩০০ টাকায়! একি মগের মুল্লুক পেয়েছেন। যান, আপনাদের কাছে সাইকেল বিক্রি করবো না।”

– “সাইকেল বিক্রি করবে না ভাল কথা। কিন্তু তোমাকে এখান থেকে সাইকেল নিতে দিচ্ছি না। এই সাইকেল থানায় যাবে। সেখান থেকে তুমি প্রমান দিয়ে তোমার সাইকেল নিয়ে যাবে।”

এই বলে সে সাইকেলটা টানাটানি শুরু করে দিল। আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম।

আমি তাদের কে বললাম,

– “আর কিছু টাকা বেশী দেয়া যাই না।”

একটা লোক বললো,

– " না, কোন মতেই না।”

আরেকটি লোক বললো,

– “আচ্ছা ছেলেটা যখন এত করেই বলছে তখন আর ১০০ টাকা বেশিই না হয় দেয়া যাক।”

এই লোকটির কথায় আরও একটি লোক সায় দিলেন। যে ব্যক্তিটি সাইকেলের দাম ৩০০ টাকার বেশি দিতে চাইলো না সেও কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় লোকটির কথাই সায় দিলেন। তারপর তারা এক রকম জোর করেই আমার হাতে ৪০০ টাকা গুঁজে দিয়ে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন। তাদের তাড়াতাড়ি সরে পড়ার কারণ আমি তখন বুঝতে পারলাম না।

সাইকেল খানা শেষ হওয়ার পর আমার সম্বল ছিল:-

একটি লুঙ্গি, একজোড়া স্যান্ডেল, একটি ফুলশার্ট, ৫০০ টাকা ও একটি ঘড়ি। যার সর্বমোট মূল্য হতে পারে ৮০০ টাকা। দেখতে পেলাম বাসা থেকে বের হবার সময় আমার মত আমার কাছে ছিল ২৫০০ টাকা। আর এখন একদিন হতে না হতে ৮০০ টাকায় নেমে এলাম। বাকি ১৭০০ টাকা হাওয়া হয়ে উড়ে গেল।

6

ব্যবসার শুরু

ভগ্ন প্রায় মন নিয়ে কিছুক্ষণ পর শাপলা চত্বর ত্যাগ করলাম। তখন বাজে ১১টা। আমি তারপর ঠিকানাহীন ভাবে ঢাকার এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। এক স্থানে দেখলাম একটা লোক অনেকগুলো আনারস সামনে নিয়ে বসে আছে। আমি ভাবলাম আনারস কিনে বিক্রি করতে পারলে হয়তো লাভ হতে পারে।

এই ভেবে লোকটার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

– "ভাই আনারসের দাম কত?"

লোকটি উত্তরে বললেন,

– "একটার দাম ৭ টাকা। তুমি কয়ডা নিবা?"

– "হিসাব করে দেখেন তো ২০০ টাকায় কয়টি পাব?"

তিনি কিছুক্ষণ হিসাব করে বললেন,

– "প্রায় ২৯টা। তয় তুমি একসাথে নিলে ৫/৬ ডা বেশি পাবা।"

– "তাহলে আপনি গুনে 200 টাকায় আনারস দেন।"

তিনি গুণে এক জায়গায় জমা করে রেখে বললেন,

– "মোট ৩৫টা দিলাম।"

আমি ওনার টাকা পরিশোধ করে একটা রিকশা ডাকলাম।

রিকশাওয়ালাকে বললাম,

– "ধারে কাছে কোথাও কি আনারস বিক্রি করার মতো কোনো জায়গা আছে?"

রিকশাওয়ালা বললেন,

– "আছে।"

– "কোথায়?"

– "ফকিরাপুল।"

– "ভাড়া কত?"

– "১০ টাকা।"

আমি উনার সাথে বেশি কথা কাটাকাটি না করে আনারস গুলো নিয়ে রিকশায় চড়ে বসলাম। ফকিরাপুল পৌঁছার পর রিকশাওয়ালা আমাকে আনারস নামাতে সাহায্য করলেন। তারপর যুৎসই একটা জায়গা বেছে নিয়ে তাতে সযত্নে আনারস গুলো সাজিয়ে নিলাম। আমি ওনাকে মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম।

তিনি আমাকে বললেন,

– "সন্ধ্যার সময় আমি একবার আসবো। আর যদি না আসি কমলাপুর রেলস্টেশনে খুঁজলেই আমারে পাবা।"

আমি ওনার হাতে দশটা টাকা দিলাম।

যাওয়ার সময় উনি বলে গেলেন,

– "যদি তুমি পান বেচার জন্য একটা বাক্স তৈরি করতে পারো তাহলে তোমাকে না খেয়ে থাকতে হবে না।"

আমি ওনার কথা বিশ্বাস করলাম। তার উপর উনি আশ্বাস দিয়ে গেলেন যে তিনি এখানে একবার আসবেন। তাই আমার ভগ্নপ্রায় মনটা একটু স্বস্তি পেল। পরক্ষণেই লোকটার উপদেশের কথা মনে পড়লো। তিনি বলেছিলেন একটা পান বেচার (বিক্রি করার) বাক্সের কথা।

আমার বিবেক তখন বলতে লাগলো,

– "ছি ছি ছি পান বেচবে? তুমি এত নিচ, এত জঘন্য।"

আমি তখন বিবেককে বোঝাতে লাগলাম যে পান বিক্রি করা খারাপ কিছু নয়। এদেশে এমন অনেক লোক আছে যারা জীবিকার জন্য এই পথটি বেছে নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমি বিবেককে বোঝাতে সক্ষম হলাম।

ধীরে ধীরে বেলা ১২টা বেজে গেল। আমি আনারস বিক্রির প্রতি মন দিলাম। একেকজন খদ্দের আসে। দাম জিজ্ঞেস করে। দামে তার মত আর আমার মত এক না হলে তারা চলে যায়। এক হলে টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যায়। কিন্তু এক পর্যায়ে কারও সাথে আমার মত এক হয়নি। সুতরাং একটি আনারসও বিক্রি হয়নি।

গড়ে প্রতিটি আনারসের দাম পড়েছে ৬.৩০ টাকা। কিন্তু কোন খদ্দেরই ৫ টাকার বেশি দিতে চাইলো না। দেখলাম আনারস বিক্রি করতে হলে আমাকে কিছু টাকা লোকসান দিয়ে বিক্রি করতে হবে। তাই ঠিক করলাম এবার যে করেই হোক পথের এর সাথে আমার একমত হতেই হবে। কিছুক্ষণ পর একজন খদ্দের এলো। তার সাথে আমার একমত হলো ঠিকই কিন্তু ৫ টাকার উপরে দাম উঠলো না। সুতরাং তাকে ৫ টাকায় আনারস দিতে হলো। এরূপে প্রায় ৫০ টাকার মতো আনারস বিক্রি হয়েছে।

এরকম সময় একটি লোক আমার কাছে এসে বললো,

– "আমি তোমার আনারস বিক্রি করে দিচ্ছি। তার বদলে তুমি আমাকে কিছু টাকা দিও।"

আমি লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। দেখে মনে হল লোকটা ভালো গোছের মানুষ। আমি ভাবলাম উনি বিক্রি করলে হয়তো কিছু লাভও হতে পারে। তাই বিনা বাক্য ব্যায়ে ওনার কথায় রাজি হয়ে গেলাম। তারপর থেকে ঐ লোকটিই আনারস সামনে নিয়ে বসে পড়লেন। আমি বসলাম উনার পাশে। কোন খদ্দের আসলে লোকটি এক দাম চেয়ে বসে ৮ টাকা। তাই খদ্দেরের সাথে একবারও তার মত এক হলো না। সুতরাং একটা আনারস উনি বিক্রি করতে পারলেন না। তখন সময় ১টা।

আমি ওনাকে বললাম,

– "ভাই, এখানে গোসল করার মত কি কোন পুকুর আছে?"

– “আছে, কিন্তু একটু দূরে। তুমি এক কাজ কর একটা গামছা কিনে নিয়ে রিকশায় করে চলে যাও গোসল করতে।”

আমি ওনার কথা মত একটা গামছা কিনে নিলাম। গামছাটার দাম এল ২০ টাকা। তারপর ওই লোকটা একটা রিকশা ঠিক করে দিলেন। আমি যে রিকশায় গিয়েছিলাম, গোসল করে আবার সেই রিকশায়ই ফিরে এলাম। পুকুরে মাত্র কয়েকটা ডুব দিতে পারলাম। এইটুকু পথের জন্য রিকশাওয়ালাকে ১০ টাকা দিতে হলো। মাগুরা হলে যেখানে ২ টাকার বেশি লাগতো না। ফিরে এসে দেখি লোকটা একটা আনারসও বিক্রি করতে পারেনি।

আমি উনাকে বললাম,

– “ভাই, আপনি দাম কমান।”

তিনি তখন দাম কমিয়ে দিলেন। কিন্তু আমার চেয়ে এক পয়সা বেশি দামেও বিক্রি করতে পারলেন না। লোকটি বিক্রি করছে আর আমি বসে বসে দেখছি। এমনিভাবে সময় পার হতে লাগলো। একসময় আকাশের দিকে চেয়ে দেখি সূর্য আমার দৃষ্টি আড়ালে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ দিন শেষ হতে আর বেশি দেরি নাই।

আমি ঐ লোকটাকে বললাম,

– “ভাই, আপনার কাছে কি কোন টাকা আছে?”

– “কেন, টাকা দিয়ে তুমি কি করবে?”

– “না, কিছু না। বলছি কি, যদি থেকে থাকে তাহলে বাকি আনারস কয়টি আপনি কিনে নেন।”

– “আছে, তবে খুব বেশি না।”

– “কত?”

– “এই ধর ২০-২৫ টাকা।”

আমি দেখলাম আমার আনারস আছে আরও ১৫টি। বাকি ২০টা বিক্রি হয়েছে ১০০ টাকায়। দেখলাম সন্ধ্যা হতেও আর বেশি দেরি নাই। ঢাকার

লোক কেমন তা দিনেই আমার জানা হয়ে গেছে। রাত্রে জানিনা তারা কতই ভয়ংকর হতে পারে।

তাই লোকটিকে বললাম,

- "ভাই, কি আর করবো, একে তো সন্ধ্যা হয়ে আসছে, তার উপর আনারস রাখার মত রাতে কোন ব্যবস্থা নাই। তাই একান্ত বাধ্য হয়েই আপনাকে এই আনারস কয়টি অতি অল্প দামে বিক্রি করতে হচ্ছে। আপনি আমাকে ২৫ টাকাযই দেন।"

আমার মুখে এই কথা শোনা মাত্রই তিনি তড়িঘড়ি করে ২৫ টাকা আমার হাতে দিয়ে আনারস গুলো নিয়ে গেলেন। তিনি সেখান থেকে চলে যাওয়ার পরও আমি সেখানে বসে রইলাম। সন্ধ্যা বেলায় এক রিকশা ওয়ালা বলেছিল এখানে আসবেন। কিন্তু সন্ধ্যা অবধি বসে থাকার পরও তিনি এলেন না।

7

কমলাপুর স্টেশন

লোকজনদের কাছে জিজ্ঞেস করে কমলাপুর রেলস্টেশনে চলে এলাম। তিনি বলেছিলেন এখানে থাকবেন। কমলাপুর এসে দেখি সে এক বিষম ব্যাপার। চারদিকে শুধু লোক আর লোক। তার ভিতর থেকে একটা নির্দিষ্ট লোককে বের করা আমার কর্ম নয়। তাই ওই আশা ছেড়ে দিলাম। আমি কমলাপুর রেলস্টেশন দেখার জন্য স্টেশনের একেবারে কাছে গেলাম। এক সময় স্টেশনের ভিতরে ঢুকে পড়লাম। স্টেশনের ভিতরে স্বাধীনভাবে ঘোরাঘুরি করছি, এমন সময় একজন পুলিশ এসে আমার কাছে স্টেশনের ভিতরে প্রবেশ করার টিকিট চাইলো। কিন্তু আমি তাকে তা দিতে পারলাম না। সুতরাং সে আমাকে ধরে নিয়ে গেল একটা রুমে। সেই রুমে কয়েকজন লোক বসেছিল। তাদের সবার পরনেই নিয়েছিল সাদা পোশাক।

পুলিশটি তাদের উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন,

– "এই ছেলেটি টিকিট ছাড়া স্টেশনে ঢুকে পড়েছে।"

তখন তাদের ভেতর একজন লোক আমার নাম লিখল।

তারপর বলল,

– "৭০ টাকা দিবা না জেলে যাবা?"

– "আমি কি অন্যায় করেছি যে, ৭০ টাকা দিতে হবে, নইলে জেলে যেতে হবে?"

– “তোমার অন্যায় তুমি টিকিট ব্যতীত স্টেশনের ভিতর ঢুকে পড়েছো?”

আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বললাম,

– “আচ্ছা, টাকা কি কম নিলে হয় না?

– “২০ টাকা কমিয়ে দিলাম। ৫০ টাকা দাও?”

– “আর কিছুই কি কমানো যায় না?”

– “তাহলে তোমাকে জেলে যেতে হবে।”

– “আচ্ছা, ঠিক আছে। এই নিন ৫০ টাকা।”

তিনি ৫০ টাকা পকেটে গুঁজে নিয়ে আমাকে ছেড়ে দিতে বললেন। পুলিশ তখন আমাকে ছেড়ে দিল।

আমি ছাড়া পেয়েই দেখতে পেলাম, একটা ট্রেন এইমাত্র চলতে শুরু করছে। আমি এক দৌড়ে ট্রেনের একটা পক্ষে ঢুকে পড়লাম। যে দরজা দিয়ে আমি ট্রেনে ঢুকলাম, সেই দরজার পাশে একটা পুলিশ বসে ছিল।

সে আমার মুখের উপর লাইট মেরে বললেন,

– “তুমি কে? এই ট্রেনে চড়েছো কেন?”

– “"

আমাকে বলার সুযোগ না দিয়েই আমার পকেট থেকে সব টাকা তুলে নিলেন।

তারপর বললেন

– “এই টাকাগুলো তো আমার ভাড়া হিসেবে নিলাম।”

– “এতগুলো টাকা ভাড়া। এ আপনি বলেন কি?”

– “বেশি কথা বললে এই টাকা থেকে একটা টাকাও তুমি ফেরত পাবে না।”

– “দেখুন, আমি অতি সাধারণ একটা ছেলে। আমার টাকা নিয়ে আপনার কোন লাভ হবে না”

– “আমিও অতি সাধারণ একটা পুলিশ। সব টাকা তোমাকে ফিরিয়ে দিলে আমারও কোন লাভ হবে না”

– "তাহলে আপনি না হয় কিছু টাকা রেখে আমাকে বাকি টাকা ফেরত দেন।"

– "৫০ টাকা দিতে পারবো।"

– "মাত্র ৫০ টাকা! আর সব টাকা আপনার হয়ে যাবে"

– "বেশি বাজে বকনা। এই নাও আরো ২০ টাকা"

– "আর কিছুই কি দেওয়া যায় না?"

– "আরো কিছু চাও নাকি। তাহলে এই নাও লাঠির বাড়ি"

এই বলে তিনি উনার লাঠি বের করতে লাগলেন। তাই আমি আর ওনার সাথে কথা বাড়ালাম না। ওনার কাছ থেকে সরে পড়লাম। পরে হিসাব করে দেখলাম, পুলিশটি আমার কাছ থেকে ২০০ টাকার মত নিয়েছে। ট্রেনটা একটা স্টেশনে এসে থামলো। আমি ঠিক করলাম এই স্টেশনেই নেমে পড়বো। তারপর না হয় একটা কাজ জুটিয়ে নেব। আমি যখন ট্রেন হতে স্টেশনে নামলাম তখন সময় রাত ৯টা। লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম স্থানটির নাম টঙ্গী। আমার মনে পড়লো অনেক আগে, আমার বয়স যখন খুব অল্প ৬ কি ৭। তখন আমার বাবা টঙ্গীর একটা টেক্সটাইল মিলে চাকরি করতেন। বাবার সাথে আমি মা ও ছোট ভাই একসাথে থাকতাম। তখন আমরা ছিলাম দুই ভাই। কিন্তু সেই সময়ে টঙ্গীর সাথে এই সময় টঙ্গীর কোন মিল খুঁজে পেলাম না।

আমি স্টেশনের বেঞ্চের উপর বসে আছি, এমন সময় এক বাদামওয়ালা আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল,

– "বাদাম দেবো?"

আমি তার মুখের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম,

– "এক প্যাকেট কত?"

– "এক ট্যাকা"

– "এক প্যাকেট দাও।"

সে আমাকে এক প্যাকেট বাদাম দিলে আমি তাকে এক টাকা দিলাম। তারপর বাদামের খোসা ছাড়িয়ে এক একটা বাদাম মুখে দিতে লাগলাম। আর

দেখতে লাগলাম স্টেশনের মানুষ বেঁচে থাকার জন্য কত বিচিত্র পন্থা অবলম্বন করছে। আমিও ভাবতে লাগলাম দেখি এদের মত কোন কাজ করতে পারি কিনা। তখনই মাথায় চলে এল, চানাচুর বিক্রি করলে কেমন হয়। এই পন্থাটার মধ্যে হয়তো আমি কোন আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলাম। তাই সেই সময়ই ঠিক করে ফেললাম আগামী কাল থেকেই আমি চানাচুর বিক্রি শুরু করে দেব। সেই সময়ে আমার একটি মাত্রই প্রয়োজন ছিল। তাহলো রাতে থাকার মত কোন জায়গা বের করা। সেই উদ্দেশ্যে স্টেশন থেকে বের হলাম। স্টেশনের নিকটে দেখলাম একটা আবাসিক হোটেল। হোটেলে ম্যানেজারের কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, এখানে একরাত্র থাকতে ৩০ টাকা লাগে। আমি আর কি করবো, উনাকে ৩০ টাকা দিয়ে রাত্রে থাকার মত একটা রুম বেছে নিলাম। বিছানায় শোয়ার পর এত চেষ্টা করলাম ঘুমানোর জন্য। কিন্তু ঘুম কিছুতেই এলোনা। বাসা থেকে এসেছি আজ দেড় দিন মত হল। ভাবছি বাসায় বসে মা এখন করছে কি। হয়তো তিনি এতক্ষণে পুরোদমে কান্না জুড়ে দিয়েছেন। বাসার কথা আর ভাবতে পারলাম না। ভাবতে লাগলাম এখনকার অর্থাৎ বর্তমানে কথা। মনে মনে ঠিক করলাম কালকে ঘড়িটা বিক্রি করে চানাচুর বিক্রি করা শুরু করে দিতে হবে। তারপর আল্লাহ পাক যা করেন, করুক। এইসব ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

৪

চানাচুর বিক্রেতা

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে হোটেলে কল থেকে হাত মুখ পরিষ্কার করলাম। তখন সময় সকাল ৭টা। হোটেল থেকে বিদায় নিয়ে আবার স্টেশনে এলাম। উদ্দেশ্য সময় কাটানোর। কারণ আমি জানতাম ঘরের দোকান ৮টার আগে খুলবে না। তাই এই একটি ঘন্টা হাতে পেয়ে স্টেশনে এসে বসলাম। বসে বসে দেখতে লাগলাম স্টেশনে লোকজনদের। আমার নজর বেশি পড়ছিল তাদের উপর, যারা স্টেশনে চানাচুর বিক্রি করে। ভালোভাবে তাদেরকে দেখে চানাচুর বিক্রি করার কলা কৌশল রপ্ত করে নিলাম। যখন আমার ঘড়িতে ৮টা বাজলো, তখন স্টেশন ত্যাগ করলাম। স্টেশন হতে প্রায় কোয়াটার মাইল যেয়ে একটা ঘড়ি দোকান পেলাম।

ঘড়ির দোকানদারকে বললাম,

– "ভাই আমি এই ঘড়িটা বিক্রি করতে চাই।"

তিনি আমার কথা শুনে আমার মুখের দিকে তাকালেন তারপর ঘরের দিকে তাকিয়ে বললেন,

– "এ যে দেখছি পুরানো ঘড়ি।"

– "পুরানো ঘড়ি হলেও এর পার্টস ভালো।"

– "কত দাম চাও?"

– "১৫০ টাকা দেন।"

– “পুরানো ঘড়ির দাম এত টাকা।”

– “আগেই তো বলেছি এর পার্টস ভালো।”

– “না বাপু, আমি তোমার ঘড়ির কিনতে পারলাম না। তুমি বরং অন্য দোকানে যাও।”

– “আচ্ছা কিছু টাকা না হয় কমই দেন।”

– “আমি ৯০ টাকা দিতে পারবো।”

– “আর কিছু টাকা বেশি দেওয়া যায় না?”

কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন,

– “আর মাত্র ১০ টাকা বেশি দিতে পড়বো।”

শেষ পর্যন্ত ১০ টাকা বেশি অর্থাৎ ১০০ টাকায় দাম ঠিক হলো। আমি ওনার সাথে বেশি কথা না বাড়িয়ে ঘড়িটা ওনার হাতে দিলাম। বিনিময় উনি আমাকে ১০০টি টাকা দিলেন। ঐ টাকা দিয়ে টঙ্গির বাজার থেকে চানাচুর বিক্রির জন্য একটা ঝুড়ি, কয়েকটা লেবু, ১ পোয়া পেঁয়াজ, ১ ছটাক কাঁচা মরিচ এবং আরো কিছু জিনিস কিনলাম, যা চানাচুর বিক্রি করার জন্য প্রয়োজন। তারপর মোদের দোকান থেকে কিনলাম ২ কেজি চানাচুর। পিয়াঁজ-মরিচ কাটার জন্য একটা ছুরি কিনলাম ফুটপাত থেকে। সবকিছু কেনার পর পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম পকেটে আর মাত্র ১০ টাকা রয়েছে। আমি টাকার কথা চিন্তা না করে চানাচুর বিক্রির প্রতি মন দিলাম। চানাচুর ঝড়ের ভিতর সাজিয়ে রাখলাম। একটা ছোট্ট পলিথিনের কাগজে মরিচ আর পিয়াজ কেটে একসাথে রাখলাম। রাতে খদ্দের আসলে কষ্ট কম হয়। এই কৌশল টা আমি রক্ত করেছিলাম স্টেশনের চানাচুর বিক্রিওলাদের কাছ থেকে। যখন সব প্রস্তুতি শেষ হলো, তখন চানাচুর বিক্রি করতে নেমে পড়লাম।

প্রথম প্রথম বিক্রি করার সময় মনের ভিতর কি রকম যেন করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর অবশ্য তা ঠিক হয়ে গেল। কোন ট্রেন এসে স্টেশনে থামলে আমি ট্রেনের কাছে গিয়ে, “চাই চানাচুর, চাই চানাচুর” বলে হাক দিতাম। আমার হাকে কেউ সাড়া দিত, কেউ দিত না। এমনিভাবে চানাচুর

বিক্রি করতে করতে কেটে গেল অনেক সময়। সূর্য যখন আমার মাথার উপর চলে এলো, তখন চানাচুর বিক্রি করা বন্ধ করলাম। বের হলাম গোসল করার মত পুকুরের উদ্দেশ্যে। কিন্তু ধারে-কাছে গোসল করার উপযুক্ত কোন পুকুর পেলাম না। অনেক কষ্টে পেলাম ছোট একটি পুকুর। পুকুর ওকে বলা যায় না। বলা যায় ডোবা। তাতে গোসল করা চলে না। কিন্তু উপায় কি? গোসল করতেই হবে। অগত্যা সেই ডোবায়ই গামছা পরে গোসল করতে লাগলাম। গোসল করে গামছা পাল্টিয়ে আবার লুঙ্গি পরলাম। তারপর শার্ট পড়ে ঝুড়ি নিয়ে স্টেশনের পাশে একটা হোটেলে ঢুকে পড়লাম। হোটেলটাতে কিছু খেয়ে-দেয়ে আবার স্টেশনে এসে চানাচুর বিক্রি শুরু করে দিলাম। এমনিভাবে সন্ধ্যা শেষ হওয়ার পরও অনেকক্ষণ ধরে চানাচুর বিক্রি করলাম। যখন ক্ষিদের কাছে পেট আত্মসমর্পণ করলো, তখন আবার স্টেশনের পাশে সেই হোটেলেতে গেলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর আবারও চানাচুর বিক্রি শুরু করলাম। চোখ ঘুমের কাছে যখন আত্মসমর্পণ করল তখন ঠিক করলাম আজ আর হোটেলে ঘুমাবো না। স্টেশনেই ঘুমিয়ে পড়বো। দেখলাম স্টেশনের প্লাটফর্মে অনেক লোক ঘুমিয়ে আছে। আমিও তাদের মাঝে আমার গামছা খানা বিছিয়ে ঝুড়িখানা পাশে নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

সকালবেলা উঠে দেখে আমার পায়ের স্যান্ডেল নাই। ভাবলাম হয়তো স্টেশনের কোন চোর চুরি করে নিয়ে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি ঝুড়ির দিকে তাকালাম। ভাগ্য ভালো ঝুরিটা নিয়ে যায়নি। স্যান্ডেল চুরি হওয়াতে আমি মনে কিছুটা কষ্ট পেলাম। কিছুক্ষণ পর কষ্ট না মন থেকে তাড়িয়ে দিল। তারপর হাতমুখ পরিষ্কার করে আবার চানাচুর বিক্রি শুরু করে দিলাম। রাত হলে গত দিনের মতো স্টেশনে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকাল হলে আবার চানাচুর বিক্রি করা। এমনিভাবে কেটে গেল পুরো ১৫টা দিন। মাঝেমধ্যে চানাচুর অথবা অন্য কোন জিনিস ফুরিয়ে গেলে, দোকান অথবা বাজার থেকে কিনে আনতাম। মানুষ কোন কিছু বিক্রি করে কিছু না কিছু লাভ পায়। আমিও চানাচুর বিক্রি করে লাভ পেয়েছি। কিন্তু আমার পেট তো সে লাভ শেষ

করেছেই তার উপর আবার কিছু লোকসানও করেছে। তাই ১৫ দিন পর দেখলাম আমার কাছে ঝুড়ি আর কয়েকটা জিনিস ব্যাহিত টাকা পয়সা এমনকি বিক্রির জন্য কোন চানাচুরও নেই। তখন ঠিক করলাম টঙ্গীতে আর নয়। এখন অন্য কোথাও পাড়ি জমাতে হবে। আমি একটা লোকের ১৫ টাকা নিয়ে চানাচুর বিক্রি করার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রি করে দিলাম। ১৫ টাকায় ওই দিন কোন মতে চললাম।

৭

নতুন শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা

পরের দিন ট্রেন আসতেই অন্যান্য লোককে (যাদের ভাড়া নেই) মতো ট্রেনের ছাদে উঠে বসলাম। তখন আমার সম্বল ছিল একটা ফুল হাতা শার্ট, একটা লুঙ্গি, আর একটা গামছা। তখন আমাকে দেখলে ভদ্রলোকের ছেলে বলে মনেই হতো না। সে যাই হোক, আমি তখন ট্রেনের ছাদে বসে ট্রেনের এক পাশে দৃশ্য কতক্ষণ দেখছি, আর খানিক পরে অন্য পাশে দৃশ্য দেখছি। এমনি ভালই পার হতে লাগলাম স্টেশনের পর স্টেশন। ছাদে বসে একটা লোকের কাছ থেকে জানতে পারলাম এই ট্রেনটির চট্টগ্রামে যাচ্ছে। ভাবলাম ভালোই হলো চট্রগ্রামের মত একটা সুন্দর শহরের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারব। সূর্য যখন মাথার উপর তখন পেট জানালো তার সমস্যার কথা। আমি বললাম পয়সা নেই। আবার উত্তর শুনে সে সেই সময়ের মত চুপ করলো। চুপ করল ঠিক নয়, চুপ করালাম। কিছুক্ষণ পর সে আবার যখন তার সমস্যার কথা জানালো, তখন ট্রেন একটা স্টেশনে থেমে আছে। আমি তাড়াতাড়ি ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনে পাশে একটা হোটেল থেকে দুই গ্লাস পানি পেতে চালালা করে দিলাম। তারপর আবার ট্রেনের ছাদে বসলাম। ট্রেন আবার চলতে শুরু করলো। এক সময় সে চট্টগ্রাম আর সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়লো। তখন ধীরে ধীরে চারদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে। তবুও আমি এই স্বল্প আলোতে যা দেখলাম তা কল্পনার অতীত। দেখলাম ছোট ছোট পাহাড়।

তার ওপর জন্ম নিয়েছে অনেক বিচিত্র ধরনের গাছ। মাঝেমধ্যে দেখলাম ট্রেনের রাস্তা পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে। পশ্চিমের আকাশে কিছুক্ষণ আগে সূর্য যে লাল আভা দেখা যাচ্ছিল, তাও এখন নেই। পূর্ব আকাশে চেয়ে দেখলাম সুন্দর চাঁদ উঠেছে। মনে পড়লো এমনি এক চাঁদের রাত্রে ছিলাম আরিচার নদীতে। চাঁদের আলোতে দেখতে লাগলাম আশেপাশে সৌন্দর্য। এক জায়গায় দেখলাম দুটো পাহাড়ের মাঝে খালের মত শুরু একটা নালা। চাঁদের আলো নালার পানির উপর পড়ে চিকচিক করছিল। আমি চারদিকে সৌন্দর্য উপভোগ করছি আর করছি। অন্যদিকে আমার কোন খেয়াল নাই। যখন অনুভব করলাম ট্রেনের গতি আস্তে আস্তে থামছে তখন খেয়াল ফিরলো। আরে বুঝতে পারলাম ট্রেন স্টেশনে থামবে। একটা লোকের কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম এটা চট্টগ্রামের পাহাড়পুর রেল জংশন বা স্টেশন। প্রেম থামার সাথে সাথে সব লোক নামতে শুরু করে দিল। আমিও তাদের পথ অনুসরণ করে নামতে লাগলাম। আমার পেটে তখন প্রচন্ড ক্ষিদে। কিন্তু পকেটে ১টা পয়সাও নাই। তারপর আবার অচেনা জায়গা। তাই কোন উপায় না দেখে রাস্তা বরাবর হাঁটতে শুরু করে দিলাম। কতদূর হেঁটে দেখলাম একটা সুন্দর হোটেল। তা সামনে কয়েকটা বেঞ্চ পাতা ছিল। ক্ষুধার তাড়নায় আমি আর হাঁটতে পারছিলাম না। তাই একটা বেঞ্চের উপরে বসে পড়লাম। ক্ষুধার জন্য আমার নারি ভুঁড়ি সব বের হয়ে আসতে চাচ্ছিল। আমি জোর করে বসে থাকলাম। তাদেরকে সাহস দেয়ার জন্য কিছুক্ষণ পর পর হোটেলে ভিতরে গিয়ে পানি খেতে লাগলাম। কিন্তু পানি আর কত খাবো। আজকে সারাদিনটা তো পানি খেয়েই সাবাড় করে দিলাম। আমার পেটে কি আর কোনদিন শক্ত খাবার যাবে না। না এমনিভাবেই আমার জীবনের অবসান ঘটবে। বাড়ি থেকে এলাম কি জন্য। কত সুখের জীবনেই না ছিলাম। মা-বাবার বড় ছেলে বলে যা চেতাম তাই পেতাম। আবার পরক্ষণেই ভাবতে লাগলাম, সেই সুখের চেয়ে এই দুঃখই আমার কাছে ভালো। এতে জানার কিছু আছে। এমনি সব চিন্তা-ভাবনা করছি, এমন সময় একটা লোক এসে

বসলো আমারই বেঞ্চে তবে একটু দূরে। তিনি অনেকক্ষণ ধরে আমাকে লক্ষ্য করলেন।

তারপর বললেন,

- "বাড়ি কোথায়?"

- "বরিশাল।"

- "এখানে কে আছে?"

- "কেউ নেই।"

- "আজ কিছু খেয়েছো?"

- "না, শুধু পানি"

- "কি! পানি ছাড়া আর তবে আর কিছুই খাওনি?"

- "জ্বি না।"

- "আমার সাথে এই দিকে এসো। দেখি তোমায় খাবারে কোন ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।"

এই বলে তিনি আমাকে হোটেলটির ভিতরে নিয়ে গেলেন। ওহো আপনাদের বলতে তো ভুলেই গেছি আমার আসল বাড়ি বরিশাল। মাগুরাতে বাবা চাকরি করতো, তাই মাগুরাতে থাকতাম। সে যাই হোক, ওই লোকটি আরো কয়েকজন লোকের কাছে থেকে কিছু টাকা জোগাড় করে হোটেলে বসিয়ে আমাকে খাওয়ালেন। পেটে এত ক্ষিদে থাকা সত্ত্বেও বেশি খেতে পারলাম না। তবুও পেটে দুটো দানা-পানি পড়েছে এটাই শান্তনা। তারপর আবার এসেছে বেঞ্চেটার উপরে বসলাম। ধীরে ধীরে লোকজন সবাই হোটেল হতে চলে যেতে লাগলো। আমিও এক সময় উঠে দাঁড়ালাম। উদ্দেশ্য রাতে থাকার মত কোন জায়গা খুঁজে বের করা। রাস্তা বরাবর কিছু দূর হেঁটে একটা দোকানের সামনে দেখতে পেলাম আমার এখানে সান বাঁধানো খালি জায়গা। তাতে লোকজন ঠাসাঠাসি করে ঘুমিয়ে রয়েছে। আমিও অতি কষ্টে তাদের ভেতর একটু জায়গা পেলাম। সেই জায়গার উপর গামছা পেতে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে পড়তে না পড়তে রাজ্যের যত ঘুম আমার চোখে এসে জড়ো হল। সুতরাং আর না ঘুমিয়ে থাকতে পারলাম না।

10

কাজের সন্ধান

ঘুম থেকে যখন জাগলাম তখন, সূর্য আকাশে উঁকি দেয়নি। ধারে কাছে একটা টিউবয়েল পেয়ে যেতেই তা থেকে হাত মুখ পরিষ্কার করে নিলাম। তারপর রাস্তা বরাবর হাঁটতে শুরু করলাম। যখন দোকান খুললো তখন দোকানে কাজ পাওয়া যায় কিনা, তাও চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু কোন দোকানেই কোন কাজ খুঁজে পেলাম না। হোটেলেও খোঁজাখুঁজি করেছি। কিন্তু সেখানেও নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছি। যখন ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে পারলাম না, তখন নিকটে কোন হোটেল পেলেই সেখান থেকে পানি খেয়ে নিতাম। এমনিভাবেই সারাদিনটা পার হয়ে গেল। সন্ধ্যার পরও কিছুক্ষণ কাজের জন্য খোঁজাখুঁজি করলাম। কিন্তু আল্লাহ আবার প্রতি সহায় হলেন না। তাই কোন কাজ খুঁজে পেলাম না। যখন দেখলাম রাত অনেক হয়েছে তখন কাজ খোজা বাদ দিয়ে খুঁজতে লাগালাম গত রাতে সেই হোটেলটি। আশা, হয়তো আজও সেই লোকটির দেখা পাব। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর শেষ পর্যন্ত হোটেলটা খুঁজে পেলাম। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর সেই লোকটিকে হোটেলে দিকে আসতে দেখলাম।

আমাকে দেখামাত্র তিনি বলে উঠলেন,

– “একি, আজও তুমি কোন কিছু খেতে পাওনি?”

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম,

- “না!”

- “কোন কাজ খোঁজার চেষ্টা করেছ?”

- “করেছি, কিন্তু———”

- “কিন্তু পাওনি, এই তো বলতে চাচ্ছ?”

- “হ্যাঁ!”

- “আচ্ছা এখন এসো কিছু খাবে, কাল আবার কাজের জন্য চেষ্টা কর।”

তিনি পুনরায় আমাকে খাওয়ালেন। খেয়ে-দেয়ে আবার চলে এলাম সেই জায়গায়। কত রাত যেখানে রাত কাটিয়েছিলাম সেখানে। মনে মনে ঠিক করলাম কাল যে করেই হোক একটা কাজ খুঁজে বের করতেই হবে। এই ভেবে লোক-জনের ভিতর ঠাসা-ঠাসি করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

11

অবশেষে কাজ পেয়ে গেলাম

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আবার সেই টিউবয়েলে হাত-মুখ পরিষ্কার করলাম। তারপর হাঁটতে লাগলাম। দোকান-পাট খুলতে শুরু করলে দোকান ওয়ালাদের জিজ্ঞেস করতেও ভুল করিনি। কিন্তু তারা কোন কাজ দিতে পারল না। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর একজন দোকান ওয়ালা কাজ দিতে পারবেন বললেন। তবে তার নিজের দোকানে না, তার পরিচিত একটা হোটেল। আমি রাজি হয়ে গেলাম তার কথায়। তখন তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন হালি শহরের ছোট একটি হোটেলে। তুমি হোটেল ওয়ালার সাথে কিছু কথা বললেন। তারপর আমাকে আড়ালে ডেকে কিছু উপদেশ দিয়ে সেখান হতে বিদায় নিলেন।

আমি কাজ পেয়ে গেলাম হোটেলে। কিন্তু হোটেলের কাজে আমি 'ক'ও জানিনা। তাই কাজ করতে প্রথম প্রথম আমার খুব অসুবিধা হতে লাগলো। আমাকে দেয়া হলো হোটেলের টেবিলের কাজ। আমার কাজ হল কোন লোক হোটেলে এলে তার কাছে এগিয়ে যাওয়া, তিনি কি খেতে চান জানতে চাওয়া এবং খাবার পরিবেশন করা। তাছাড়া আরো অনেক কাজ আমাকে করতে হতো। যেমন, পুকুর হতে প্রতিদিন কলস ভর্তি করে পানি আনা, টেবিল পরিষ্কার করা সহ হোটেল পরিষ্কার করা, ইত্যাদি।

হোটেলে আমি আমার পরিচয় দিয়েছিলাম এই বলে যে, আমার কোন বাবা মা নেই। তাই তারা(হোটেলে লোকেরা) মোটা-মুটি ভালো চোখেই দেখতো। হোটেলের কাজ করতে করতে কয়েকদিন কেটে গেল।

একদিন পাশের একটা মুদির দোকানে ছেলে কথা প্রসঙ্গে আমার কাছে জানতে চাইলো,

- "সত্যি কি তোমার কোন বাবা মা নেই?"

আমি তার মুখের দিকে কতক্ষণ চেয়ে থাকলাম। তার উত্তর দিতে পারলাম না।

সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল,

- "সত্যি কি তোমার কোন বাবা মা নেই?"

এবার আমার মুখ খুললাম। আমি তাকে বললাম,

- "সত্যি কথা বলতে পারি এক শর্তে?"

- "কি শর্তে?"

- "তুমি আমার কথা কাউকে বলবে না!"

- "কাউকে বলবো না।"

- "তোমার মাথা ছুঁয়ে বলো?"

- "ঠিক আছে, এই আমি আমার মাথা ছুয়ে বলছি, কাউকে বলবো না।"

- "তাহলে শোনো, সত্যি বলতে কি আমার বাবা-মা সবাই আছে।"

- "তাহলে এখানে যে বললে, তোমার বাবা-মা কেউ নেই!"

- "মিথ্যা বলেছে!"

- "কি কারনে মিথ্যা কথা বলতে গেলে?"

- "কারণ আমি কোন কাজ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। যেখানে কাজ খুঁজতে গিয়েছি সেখানে আমি সত্য কথা বলেছি। আমার সব কথা শুনে তারা দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। কখন ঠিক করলাম দেখি মিথ্যা কথা বলে কোন কাজ পায় কিনা। কি আশ্চর্য! মিথ্যা বলার সাথে সাথে এই হোটেলে কাজ পেয়ে গেলাম।"

- "তুমি কিন্তু অন্যায় করেছ!"

- “আমি স্বীকার করছি আমার খুব অন্যায় হয়েছে। তোমার দোহাই তুমি এই কথাটি কাউকে বলো না।”

সে মিটি মিটি হেসে বলল,

- “ঠিক আছে, বলবো না।”

তার মিটি মিটি হাসার কারণ তখন বুঝতে পারলাম না।

বুঝতে পারলাম তখন, যখন হোটেল ওয়ালা আমায় ঘরে ধাক্কা দিয়ে বললেন,

- “বের হয়ে যা আমার হোটেল থেকে। মা-বাবা থাকতোও বলেছিস মা-বাবা নেই। মিথ্যাবাদী কোথাকার। যা, বের হয়ে যা।”

ওনার চিৎকার শুনে অনেক লোক সেখানে জড়ো হল। তারা কি ব্যাপার বুঝতে পেরে মাটিতে থুতু ফেলতে লাগলেন। আমি আর সেখানে থাকতে পারলাম না। লম্বা দ্রুত পা চালাতে লাগলাম উদ্দেশ্যহীন ভাবে সামনের দিকে। যাওয়ার সময় দেখলাম সেই ছেলেটি ঠিক সেই একই ভাবে আমার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসতে লাগলো। তাকে দেখে আমার রাগ হবার কথা। কিন্তু আশ্চর্য কোন রাগ হলো না। বরং বিবেক আমাকে বোঝাতে লাগল নিজেকে শুধরে নেওয়ার জন্য। আমি বিবেকের উপদেশে সারা দিলাম। মনে মনে ঠিক করলাম আর মিথ্যা কথা বলবো না। মরে গেলেও না। যথেষ্ট শায়েস্তা হয়েছে আমার।

12

ছেলে ধরার খপ্পর

যখন হোটেল থেকে বের হয়েছিলাম তখন সন্ধ্যা হতে কিছু বাকি ছিল। এখন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়ে এলো। আমি হাটছি এমন সময় সামনে একটা লোক দেখে থেমে গেলাম।

একদিন কি কারণে যেন রাতে হোটেল থেকে বাইরে বের হয়েছিলাম। সহসা কোথা থেকে যেন এই লোকটি এসে আমার হাত ধরল। তারপর বলল,

– "তোমাকে আমার সাথে যেতে হবে।"

– "কোথায়?"

– "তা পরে বলব।"

এই বলে তিনি আমার হাত ধরে টানতে লাগলেন। আমি সহসা বুঝে ফেললাম উনি কে। উনি আমাকে ধরে নিয়ে হয়তো আমাকে মেরে ফেলবেন। তারপর আমার শরীরের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ(যেমন, চোঁখ, রক্ত, কিডনি, মস্তিষ্ক) চড়া দামে বিক্রি করবেন। আর তা না হলে আমার হাত পা ভেঙ্গে আমাকে কোন এক স্থানে ভিক্ষা করতে বসিয়ে দেবে। ভিক্ষা করে যা পাব সবই উনি নিয়ে নেবে। বিনিময় আমাকে দেবেন দু মুঠো ভাত। এইসব কথা চিন্তা করে আমার বুকটা ধপাস ধপাস করতে লাগলো। মনে মনে ফন্দি আটতে লাগলাম কিভাবে উনার হাত থেকে বাঁচতে পারব। এখন হয়তো আমি চিৎকার করে কোন লোক জড় করতে পারে। কিন্তু ও সাহস

আমার হলো না। তাই খুঁজতে লাগলাম অন্য কোন উপায়। আমার নিজের অজান্তে উপায়টা আমার হাতে চলে এলো। এতক্ষণ উনি আমাকে ওনার ওই হাত দিয়ে ধরে রেখেছিল। যখন দেখল আমি নড়াচড়া করছি না, উনি যেদিকে ইচ্ছা নিয়ে যাচ্ছেন। তখন উনি আমাকে দুই হাজার বলে এক হাত দিয়ে ধরে রাখলেন। এই অবস্থাকে আমি উত্তম সুযোগ মনে করে ওনার হাতে বসিয়ে দিলাম তোরে একটা কামড়। কামড়ে জ্বালায় উনি আমাকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। উনার নিজের অজান্তেই আমার হাত ওনার হাত থেকে মুক্ত হয়ে গেল। হাত মুক্ত হওয়া মানেই আমার নিজের মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। আমি এই সম্ভাবনাকে সঠিকে পরিণত করার জন্য দিলাম সারা শরীরের জোরে দৌড়। দৌড়ে আমার সাথে আমার বয়সি খুব কম ছেলেই পারত। স্কুলে ক্রিয়া অনুষ্ঠানে প্রায়ই দৌড়ে একটা প্রাইজ পেতাম। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। তুমি আমাকে ধরার জন্য দৌড় দিলেন ঠিকই। কিন্তু ধরতে পারলেন না। এক দৌড়ে পৌঁছে গেলাম হোটেলে। আজ আবার তারই সাথে দেখা হল। এ আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আমাকে দেখে উনি বিজয় হাসি হাসলেন। উনার হাসি দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

আমার কাছে এসে উনি বললেন,

– "কি হে, সেদিন এরকম দৌড় দিয়েছিলে কেন?"

আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। উনি আমাকে বললেন,

– "সে যাই হোক। এখন আমার সাথে এসো। এক কাপ চা খাবে।"

আমি ভাবলাম উনি চা খাওয়ানোর কথা বলে আমাকে হয়তো অন্য কোথাও নিয়ে যাবেন। তাই ওনাকে বললাম,

– "আমি চা খাই না।"

– "চা খাও না, তাই বললে এখন খাবে না, এমন কোন কথা নেই।"

আমি দেখলাম ওনার সাথে আমি কোথায় পারব না। তাই চুপ করে রইলাম।

কতক্ষন পর উনি আমাকে বললেন,

- "তোমার কোন ক্ষতি আমি করবো না। আজ থেকে তোমাকে আমি ভাই বলে গ্রহণ করে নিলাম।"

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, উনি আমাকে কথার মাধ্যমে ভুলাতে চাচ্ছেন। এই কথার মাধ্যমে কাউকে ভুলানো, আমাদের স্কুলের ছাত্রদের(বিশেষ করে আমার ক্লাসে ছাত্রদের) একটা হবিতে পরিণত করা হয়েছিল। আমাদের ভেতর সবসময় একটা প্রতিযোগিতা লেগেই থাকতো, কে কত কাউকে কথার মাধ্যমে ভুলাতে পারে। দৌড়ের মত এ প্রতিযোগিতা ও আমার সাথে অনেকে পারত না। সে ভরসাতেই উনার সাথে কথায় প্রতিযোগিতায় নামলাম।

আমি ওনাকে উদ্দেশ্য করে বললাম,

- "আপনি আমাকে যেহেতু ভাই বললে স্বীকার করে নিয়েছেন, সেহেতু আমার পিছনে আপনি লাইগেন না।"

- "আসলে, তুমি খুব চালাক। তোমার সাথে আমি চালাকিতে পারলাম না। স্বীকার করছি আমি একটা খারাপ লোক। খারাপ লোক হিসেবে তোমাকে আমি একটা উপদেশ দিচ্ছি তা হলো, আমার কাছ থেকে তুমি হয়তো রক্ষা পেতে পারো। কিন্তু এই শহরে আমার মত আরও অনেক খারাপ লোক রয়েছে। তাদের হাত থেকে তুমি রক্ষা নাও পেতে পারো। তাই বলছি কি, তাড়াতাড়ি যে কোন একটা কাজ যুগিয়ে নেও। আশা করি আমার উপদেষ্টা তুমি মেনে চলবে। এখন এস, এক কাপ চা খাবে।"

আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়লাম তো। জীবনে আমি অনেক লোকের সাথে কথার প্রতিযোগিতায় নেমেছি। কিন্তু এই রকম লোক দেখিনি কোনদিন। নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়ে কথার প্রতিযোগিতা করে, এমন লোক জীবনে এই প্রথম দেখলাম। আমিও হেরে যাওয়ার পাত্র নই।

ওনাকে বললাম,

- "ভাই আপনার উপদেশের জন্য অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আপনার অনুরোধটা রক্ষা করতে পারছি না। আমি আপনার সাথে চা খেতে যেতে পারছিনা।"

– “ঠিক আছে, তুমি যা মনে কর। আমি তোমার জন্য দোয়া করছি তুমি যেন ভালো থাকো।”

এই বলে উনি চলে যেতে লাগলেন। আমি ওই লোকটার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করতে লাগলাম। কিন্তু আমার এই কৃতজ্ঞ বোধটা বেশিক্ষণ থাকলো না। ঐ লোকটা আমার কাছ থেকে কতদূর দিয়ে আরেকটা লোককে, আমাকে উদ্দেশ্য করে চাপা স্বরে কি যেন বললেন। প্রথম ব্যাক্তির(আমার সাথে যার কথা হয়েছে) কথা শুনে দ্বিতীয় ব্যাক্তি(আমার সাথে যার কথা হয়নি) আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। সাথে সাথে আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম, উনি(দ্বিতীয় ব্যাক্তি) আমাকে ধরতে আসছেন।

আমাকে ধরেই হয়তো উনি বলবেন,

– “পকেট চোর, পকেট মাইরের আর জায়গা পাওনা!”

ওনার কথা শুনে নিশ্চয়ই পাবলিক জড়ো হবে। আর বাংলার পাবলিকের তো আপনারাই চেনেন। তাদেরকে যা বোঝানো হয় তাই তারা বোঝেন। যদি কেউ কোনমতে তাদের বোঝাতে পারে যে আমি পকেট চোর, তাহলে তাদের(পাবলিকদের) সহস্র কিল এসে আমার পেটে, পিঠে, বুকে, মুখে এসে পড়বে। এই ভয়ে আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। দৌড়াতে লাগলাম, ঠিক ওনার(যিনি আমার দিকে আসতে ছিলেন) বিপরীতে। দৌড়ে আমি ভালো তা তো পূর্বেই বলেছি। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। উনি আমার সাথে দৌড়িয়ে পারলেন না। দৌড়াতে দৌড়াতে যখন ভাবলাম আমি উনার হাত থেকে মুক্ত তখন দৌড় বন্ধ করলাম। ধীর গতিতে হাঁটতে লাগলাম।

13

ইমাম সাহেবের বাড়ি

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় দেখলাম সামনে একটা মসজিদ। তখন মসজিদে এশার আজান হচ্ছিল। ভাবলাম এই মসজিদে এশার নামাজটা পড়ে যাই। এইভাবে মসজিদের পাশের পুকুর হতে ওযুর পর্বটা সেড়ে ফেললাম। তারপর মসজিদের ভিতরে ঢুকে পড়লাম। মসজিদে ঢুকে দেখলাম আমার থেকে কিছুটা বয়সে বড়, এমনি একটা ছেলে মসজিদের এক কোণে বসে পবিত্র কোরআন শরীফ পাঠ করছে। আমিও কিভাবে কোরআন শরীফ পাঠ করতে হয় তা জানতাম। তাই আর বিলম্ব না করে মরবে তার থেকে একটা কোরআন শরীফ নামিয়ে আনলাম। তারপর আরেকটা তার থেকে রেয়াল* এনে মসজিদের ভিতরে বসে পড়তে শুরু করে দিলাম।

(রেয়াল* হলো কাঠের তৈরি জিনিস। যার সাহায্যে কোরআন শরিফ উপরে রেখে পড়া যায়।)

কিছুক্ষণ পর একটা লোক এসে আমাকে বললেন,

– "এখন পড়া বাদ দাও।"

আমি বললাম,

– "কেনো?"

– "এখন নামাজ হবে।"

আমি আর কথা না বাড়িয়ে কোরআন শরীফ এবং রেয়াল যথাস্থানে রেখে দিলাম। তারপর সবার সাথে নামাজ পড়তে দাঁড়িয়ে গেলাম। মেয়ে লোকটি আমাকে কোরআন শরীফ পড়া বন্ধ করতে বলেছিলেন দেখলাম তিনি সবার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি বুঝতে পারলাম উনিই মসজিদের ইমাম সাহেব। নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে এলাম। মসজিদের পুকুর পাড়েই ছিল একটা ইটের তৈরি বেঞ্চ। পার্কে যেমনটি থাকে। আমি সামনে-পিছনে কোন চিন্তা-ভাবনা না করে বেঞ্চটিতে শুয়ে পড়লাম। সবাইকে দেখলাম একা একা করে মসজিদে থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন যার যার বাড়ির উদ্দেশ্যে। এক সময় মসজিদের ইমাম সাহেব মসজিদ থেকে বের হয়ে এলেন।

তিনি আমাকে বেঞ্চের উপর শুয়ে থাকতে দেখে বললেন,

- "কে এখানে?"

আমি ওনার উত্তরে বললাম,

- "হুজুর আমি।"

- "ও তুমি। তোমাকেই না মসজিদের ভিতর কোরআন শরীফ পড়তে দেখেছি। না এখানে শুয়ে রয়েছো কেন?"

- "যাবার মতো কোনো জায়গা নেই, তাই।"

- "কোন কাজ করতে পারো না?"

- "কাজ করতে চাই। কিন্তু পাইনা।"

- "তাই বলো! তা আগে বললেই হয়।"

তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে আমায় তিনি বললেন,

- "এখন আমার সাথে চলো। আমার বাসায় আজ রাত্রে থাকবে। আগামী কালকে তোমার একটা ব্যবস্থা করা যাবে।"

এই বলে উনি আমাকে ওনার বাসায় নিয়ে গেলে। তারপর একটা চকি দেখিয়ে দিয়ে বললেন,

- "ওটাতে শুয়ে পর।"

আমি ওনার কথামতো চকিটাতে শুয়ে পড়লাম। সাথে সাথে ঘুমিয়েও পড়লাম। না ঠিক ঘুমিয়ে পড়লাম না, হারিয়ে হয়ে গেলাম। কোথায় যে গেলাম তা আমি নিজেও জানিনা। হয়তো কোন স্বপ্নের রাজ্যেই গিয়েছিলাম। ফিরে এসে শুনি হুজুর আমাকে ডাকছেন। তিনি ডাকছিলেন, ফজরে নামাজ পড়ার জন্য। ওনার ডাক যখন আমার কানে পৌঁছালো, তখন স্বপ্নের জগতকে বিদায় জানিয়ে চলে এলাম বাস্তব জগতে। অর্থাৎ ঘুম থেকে উঠে পড়লাম। তারপর হুজুর আর আমি রওনা দিলাম মসজিদের উদ্দেশ্যে। মসজিদে কাছে এসেই সেই সেই পুকুর হতে দুজনে অজু করে নিলাম। তারপর মসজিদের ভিতরে ঢুকে পড়লাম। মুয়াজজেন আগেই তার আজান পর্বটা সেরে ফেলেছিল। আমরা মসজিদে পৌঁছানোর পূর্বে কিছু লোক মসজিদে জমায়েত হয়েছিল। পৌঁছানোর পরে কিছু লোক জমায়েত হলো। সবার উদ্দেশ্য নামাজ পড়া। যখন নামাজ পড়া নির্দিষ্ট সময় আমাদের সামনে হাজির হলো, তখন সবাই নামাজ পড়তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম ইমামের পিছনে। নামাজ শুরু হলে আমরা সবাই মাথা নত করে পেটে হাত বাঁধলাম। এমন ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম, যেন আল্লাহর কাছে আমরা মস্ত বড় অন্যায় করে ফেলেছি। সেই অন্যায়ের জন্য তার কাছে অমবেত ভাবে মাফ চাচ্ছি। দাঁড়ানো অবস্থা থেকে যখন সেজদায় লুটিয়ে পড়লাম, তখন মনে হল আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করেননি। তাই তার পা জড়িয়ে ধরে একান্ত অনুশোচনায় সাথে মাফ চাচ্ছি। নামাজের সব শেষে শুরু হল মোনাজাতের পালা। মোনাজাত শেষে যখন মসজিদে থেকে বের হয়ে এলাম, তখন মনে হলো আল্লাহ আমাদের মাফ করে দিয়েছেন। এবং আমাদের মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তাই আমরা মসজিদ থেকে বের হয়ে এসেছি। আমি মসজিদের বাইরে এসে হুজুরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। হুজুর মসজিদ থেকে বের হয়ে এসে পুনরায় ওনার বাসায় নিয়ে গেলেন।

তারপর ওনার বিছানার তলা থেকে পাঁচটা টাকা দিয়ে বললেন,

– "এই টাকা দিয়ে কিছু খেয়ে নিও। তারপর ৫ নম্বর জেটির কাছে গিয়ে একটা হোটেল দেখতে পাবে। সেই হোটেলে সোহরাব নামে একটা ছেলে কাজ করে। সোহরাবের কাছে আমার কথা বলবে হয়তো ও তোমাকে কোন কাজ দিতে পারবে।"

আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম,

– "হুজুর জেটি জিনিস টা কি?"

– "সেটাও চেনো না। জেটি হলো সামুদ্রিক বন্দর যেখানে জাহাজ থামে।"

– "তাই বলেন! আমি ভাবলাম কি যেন কি।"

– "থাক, আর কি যেন কি ভেবে কাজ নেই। এখন যেখানে যেতে বললাম সেখানে যাও। দেখো সোহরাব কোন কাজই দিতে পারে কিনা।"

আমিও আর কথা না বাড়িয়ে হুজুরের কথামতো ৫ নম্বর জেটির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। পথে একটা হোটেল থেকে হুজুরের দেওয়া ৫ টাকা দিয়ে কিছু খেয়ে নিলাম। তারপর আবার চলতে শুরু করে দিলাম। শেষ পর্যন্ত অনেক হাটা-হাটির পর ৫ নম্বর জেটিতে পৌঁছাতে পারলাম। জেটির পাশে অনেকগুলো হোটেল দেখতে পেয়ে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমি ভেবে পেলাম না কোন হোটেল দিতে সোহরাব থাকে।

তাই প্রতিটি হোটেলে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম এই বলে,

– "এখানের সোহরাব নামে কোন ছেলে কি কাজ করে?"

অনেক খোঁজা-খুঁজির পর সোহরাব যে হোটেলটিতে কাজ করে, সেই হোটেলটি খুঁজে পেলাম। কিন্তু সোহরাব তখনও হোটেলে এসে পৌঁছায়নি। তাই তার আসার অপেক্ষায় হোটেলের চেয়ারে বসে রইলাম। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর সোহরাব হোটেলে এল। আমাকে সে চিনত না। আর চিনবেই বা কি করে। আগে কি কখনো দেখা হয়েছে, যে আমাকে সে চিনবে।

যখন আমার কাছে থেকে ও জানতে পারল হুজুর আমাকে পাঠিয়েছে, তখন কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল,

– “এই হোটেলে তো কোন কাজ নেই। দেখি তোমার জন্য অন্য কোন হোটেলে কাজ জোগাড় করতে পারে কিনা।”

এই বলেছে আমাকে নিয়ে হোটেলের বাইরে যেতে উদ্যত হল।

হোটেলের দরজার কাছে এসে ও আমাকে জিজ্ঞেস করল,

– “কিছু খেয়েছো?”

আমি ওনার উত্তরে বললাম,

– “খেয়েছি।”

আমার খেয়েছি কথা শুনেও না শোনার ভান করে আমাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল,

– “এখানে বসো, আমি একটু পরে আসছি।”

এই বলেছে হোটেলের রান্না ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল। কিছুক্ষণ পর সে আমার জন্য চারটি পড়াটা ও এক প্লেট ভাজি নিয়ে এলো।

আমি ওকে বললাম,

– “খামোখা, এই খাবার আনার কোন দরকার ছিল না”

উত্তরে ও বলল,

– “এ খামোখা না। তোমার এই খাবারের প্রয়োজন ছিল।”

আমি ওর সাথে আর কথা বাড়ালাম না। খাওয়া শেষে আমাকে নিয়ে সে হোটেল থেকে বের হয়ে এলো। তারপর একের পর এক হোটেলে জিজ্ঞেস করতে লাগলো আমার কাজের জন্য। কিন্তু কোন হোটেলে কাজ পাওয়া গেল না।

আমি তখন সোহরাবকে বললাম,

– “ভাই তুমি আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছ। আর না, এখন আমি নিজে চেষ্টা করে দেখি কোন কাজ খুঁজে পাই কিনা।”

ও বলল,

– “সেকি! এখনই যাবে কেন? হুজুর যখন তোমাকে পাঠিয়েছে, তখন তোমার একটা উপায় বের করতেই হবে।”

– “তুমি আমার জন্য উপায় বের করার চেষ্টা করেছ। এটাই যথেষ্ট।”

– "না, এটাই যথেষ্ট না। তোমার জন্য আমি কিছু করতে পারিনি।"

আমি দেখলাম, ওর সাথে কথায় পারবো না। তখন ওর কাছ থেকে জোর করে বিদায় নিলাম। এজন্য ও খুব মনে কষ্ট পেয়েছে।

সোহরাবের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পর একের পর এক হোটেল থেকে শুরু করে মুদির দোকান, যন্ত্রপাতির দোকান, ওয়ার্কশপ, ঘড়ির দোকান ইত্যাদি যাবতীয় দোকানে কাজ খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু কোথাও কোন কাজ পেলাম না। কাজ খুঁজতে খুঁজতে দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়ে গেল। তবুও কোন কাজ খুঁজে পেলাম না। আরো কিছুক্ষণ খোঁজা-খুঁজির পর যখন রাত্র হয়ে এলো, তখন কাজ সোজা বাদ দিলাম। খুঁজতে লাগলাম গতকালের সেই মসজিদটি। অনেকক্ষণ খোঁজা-খুঁজির পর মসজিদে খুঁজে পেলাম। তারপর মসজিদের কাছে এসে পুকুরটি হতে ওযু করে মসজিদে ঢুকে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর মুয়াজ্জিন এশার আজান দিলেন। আজান শেষে মসজিদে যেয়ে কয়জন লোক ছিলাম, তারা মোনাজাত পর্ব শেষ করলাম। কিছুক্ষণ পর ইমাম সাহেব মসজিদের ভিতরে ঢুকলেন। আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন মসজিদের একপাশে।

তারপর চাপাস্বরে ফিসফিস করে বললেন,

– "সোহরাব কি কোন কাজ দিতে পারেনি?"

– "তার কোন দোষ নেই। সে অনেক খোঁজা-খুঁজি করেছে। কিন্তু কোন কাজ খুঁজে পাইনি।"

– "আচ্ছা, এখন নামাজ পড়ো। নামাজ শেষে দেখা যাবে।"

এই বলে তিনি সব লোকের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন নামাজ পড়ানোর জন্য। আমরা সবাই ওনার পিছনে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে গেলাম।

নামাজ শেষে ইমাম সাহেব আমাকে উদ্দেশ্য করে মসজিদে ভেতর সব লোকদের বললেন,

– "এই ছেলেটা কাজ করতে চায়। কিন্তু কোন কাজ খুঁজে পাচ্ছি না। আপনারা যদি ওকে একটা কাজের সন্ধান করে দিতে পারতেন, তাহলে আমি খুব খুশি হতাম।"

হুজুরের মুখে এই কথা শোনা মাত্রই একটা লোক বলে উঠলো,

– "আমি এই ছেলেটার জন্য একটা হোটেলে কাজ দিতে পারব।"

হুজুর বললেন,

– "ঠিক আছে, আপাতত ওটাতেই চলবে।"

তারপর আমাকে উদ্দেশ্য করে আবার উনি(হুজুর) বললেন,

– "যাও ওনার সাথে।"

আমি হুজুরের অনুমতি পেয়ে ওই লোকটার সাথে রওনা হলাম। মসজিদের একেবারে নিকটেই ছিল হোটেলটি। হোটেলে বসে ছিলেন একজন বুড়ো গোছের মানুষ।

আমাকে যে লোকটা নিয়ে গিয়েছিল তিনি হোটেলে বসা বড় লোকটাকে বললে,

– "চাচা, একদিন আপনি বলেছিলেন যে, আপনার একটা কাজের লোকের দরকার। তাই এই ছেলেটিকে নিয়ে এসেছি।"

বুড়ো লোকটি বললেন,

– "এনেছেন। এনে ভালোই করেছেন।"

তারপর আমাকে উদ্দেশ্য করে তিনি(বুড়ো লোকটি) বললেন,

– "এর আগে কোন হোটেলে কি কাজ করেছ?"

আমি বললাম,

– "হ্যাঁ, করেছি।"

– "কোন হোটেলে?"

– "হালি শহরের একটা হোটেলে।"

– "ঠিক আছে। তোমাকে আমার হোটেলে কাজ দিলাম। প্রতিমাসে বেতন পাবে ৩০০ টাকা। আর খাবার ফ্রি।"

আমি ওনার কথায় রাজি হয়ে গেলাম। যে লোকটা আমাকে নিয়ে এসেছিল, তিনি কিছুক্ষণ পর চলে গেলেন। আমি এই হোটেলে ঠাই পেলাম। ধীরে ধীরে হোটেলের কাজ শুরু করে দিলাম। প্রথম প্রথম নতুন জায়গায়

কাজ করতে আমার যেন কেমন লাগছিল। অবশ্য কিছুক্ষণ কাজ করার পর তা ঠিক হয়ে গেল।

14

বৃদ্ধ লোকের হোটেল

হোটেলওয়ালার তিন ছেলে। আর তিন ছেলেই হোটেলের কাজ করে। তারা প্রত্যেকেই আমার চেয়ে বয়সে বড়। তিনজনের দুইজনে করতো রান্নার কাজ। আর একজনে করত টেবিলের কাজ। হোটেল ওয়ালা নিজে করতেন হিসাবের কাজ। পূর্বের হোটেলে যে কাজ ছিল এবারও সেই কাজ দেওয়া হল। অর্থাৎ টেবিলের কাজ। তাছাড়া আমার করতে হতো থালা-বাসন পরিস্কার, পুকুর থেকে পানি আনা, টিউবওয়েল থেকে পানি আনা ইত্যাদি।

এখানকার সব হোটেলের খাবার পানি নিকটবর্তী একটি টিউবওয়েল থেকে কিনে আনতে হতো। আমি যে হোটেলে কাজ করতাম সেই হোটেলওয়ালা ছিল একটু চালাক-চতুর লোক। চিনির পুকুরের পানি আর টিউবওয়েল পানি একত্রিত করে মানুষদের খাওয়াতে। এতে তার অল্প হলেও কিছু পয়সা বাঁচতো। কিন্তু তিনি কি জানতেন তার এই অল্প কয়টি পয়সার লাভের জন্য কত লোকের কত মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। হয়তো জেনে শুনেই তিনি এই কাজে হাত দিয়েছিলেন। অথবা অজ্ঞতার জন্য জানতে পারেননি দূষিত পানি খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম তিনি জেনে শুনে এই কাজে হাত দিয়েছেন। কেননা তুমি কোন সময়ে খারাপ পানি খেতেন না। আমি ওনার এই পন্থাটি সহজভাবে মেনে নিতে পারলাম না। তবুও একান্ত বাধ্য হয়ে সবকিছু সহ্য করতে হতো।

প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠতাম। ফজরের আযানেরও আগে। ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ না ধুয়েই হোটেলের প্রাথমিক কাজ করতে হতো। যেমন:- হোটেল পরিষ্কার করা, থালা-বাসন পরিষ্কার করার ইত্যাদি। যখন কাজ করতে করতে সকাল হয়ে যেত, তখন কয়লা দিয়ে দাঁত মেজে পুকুর থেকে হাত-মুখ পরিষ্কার করতাম। তারপর আবার হোটেলে এসে হোটেলের কাজ শুরু করে দিতাম। সকালে নাস্তার সময় আমাকে দেয়া হতো চার-পাঁচটা রুটি আর ভাজি। খাওয়া দাওয়ার পরে পুরো দমে দুপুর ১টা-২টা পর্যন্ত কাজ করতে হতো। দুপুরের খাবার আমার উপর বরাদ্দ ছিল:- দুই প্লেট ভাত আর সাথে অন্য যেকোনো তরকারি। বেশি দিনই আমার ভাগে পড়তো শাক-সবজি।

যদি হোটেলের খাবার পানি ফুরিয়ে যেত তাহলে প্রথমে আমাকে টিউবওয়েল এর পানি কিনে আনার জন্য পাঠানো হতো। তারপর পাঠানো হতো পুকুর থেকে পানি আনার জন্য। এই দুটো জায়গায় পানি একত্রিত করে হোটেলের খদ্দেরদের খাওয়ানো হতো। হোটেল ওয়ালার একটু দয়া ছিল তিনি এই মিশ্রিত পানিতে পুকুরের পানি বেশি দিলেও তাতে ফিটকারি দিয়ে পানি বিশুদ্ধ করার একটা চেষ্টা করতেন। কিছুদিন ফিটকারি দেওয়ার পর যখন দেখলেন এতে তার খরচ বেশি হচ্ছে, তখন উনি ফিটকারি দেওয়া বাদ দিলেন।

একদিন হোটেলওয়ালার বড় ছেলে আমাকে বলল,

- "মাছ ধরতে যাবি?"

আমি বললাম,

- "কোথায়?"

- "কেন, সমুদ্রে।"

- "সমুদ্র কোথায়?"

- "বেশি দূরে নয়। এখান থেকে ১ মাইল দূরে।"

- "যাব।"

- "তাহলে চল।"

এই বলেছে হোটেলের ভিতর থেকে একটা পেন্নি* নিয়ে এলো।

তারপর বলল,

– "চল।"

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম,

– "মাছ ধরে রাখবেন কিসে?"

সে বলল,

– "বড্ড, ভুলে গেছি। তুই এখানে দাঁড়া আমি একটা ঝুরি আনছি।"

এই বলেছে আবার হোটেলের ভিতর প্রবেশ করল। তারপর একটা ঝুড়ি হাতে নিয়ে বের হয়ে এলো। তার প্রস্তুতি শেষ হলে আমরা মাছ ধরার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

পেন্নি* খোলো এক ধরনের হাল। যার চারপাশে বাসের বেড়া থাকে। পানির ভিতরে ডুবিয়ে টেনে নিতে হয়, মাছ ধরার জন্য।

প্রায় এক মাইল মতো হেঁটে আমরা সমুদ্র দেখতে পেলাম। জীবনে এই আমি প্রথম স্বচক্ষে সমুদ্র দেখতে পেলাম। তাই সমুদ্র দেখার সাথে সাথে আমার মনটা দুলে উঠলো। আমরা আস্তে আস্তে সমুদ্রের কাছে অগ্রসর হতে লাগলাম। এক সময় সমুদ্রে মাছ ধরতেও নেমে পড়লাম।

তখন সমুদ্রে ভাটা ছিল। হোটেল ওয়ালার বড় ছেলে কিছুক্ষণ মাছ ধরার পর ক্লান্ত হয়ে পরল।

এক সময় আমার হাতে পেন্নি দিয়ে বলল,

– "তুই মাছ ধর আমি একটু জিড়িয়ে নেই।"

– "ঠিক আছে।"

তারপর থেকে আমি মাছ ধরতে শুরু করে দিলাম। পেন্নিটা অনেকক্ষণ ধরে সমুদ্রের কুলের পানিতে টানলাম। তারপর পানি থেকে উঠিয়ে আনলাম উপরে। কারণ এতক্ষণে যে মাছ পেন্নি জালে বেধেছে তা বেছে নেয়ার জন্য। উপরে উঠেই পেন্নির ভিতরে দেখতে পেলাম একটা সাপ। আমি আর আগা-গোড়া চিন্তা ভাবনা না করে দিলাম এক দৌড়।

তারপর হোটেলওয়ালার বড় ছেলেকে বললাম,

- "পেন্নিতে সাপ উঠেছে।"

সে আমাকে বলল,

- "সাপ উঠেছে তো কি হয়েছে। তাই বলে দৌড়ে পালাতে হয় নাকি।"

এই বলেছে যে এক দৌড়ে পেন্নিটার কাছে গেল। আমি তার সাহস দেখে অবাক হয়ে গেলাম। পেন্নির কাছে গিয়ে সে পেন্নিটা আস্তে করে জাগিয়ে তুললো। ফলে সাপটা আস্তে আস্তে পেন্নি থেকে বের হয়ে গেল।

সেদিনকের মত মাছ ধরা এই পর্যন্ত ইতি করলাম। চলে এলাম হোটেলে। পুকুর থেকে গোসল করে কিছু খেয়ে নিলাম। তারপর বিশ্রাম নিয়ে আবার হোটেলের কাজ শুরু করে দিলাম।

হোটেলের পাশেই ছিল নাবিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। তাই হোটেলের বেশিরভাগ লোকই আসতেন নাবিক। ওনারা হোটেলে বসে খাবার খাওয়ার সাথে সাথে হরেক রকম আলাপ করতেন। ওনাদের আলাপ থেকে জানতে পারলাম যে, ওনাদের মধ্যে কেউ কেউ জাহাজ চালাচ্ছে আর কেউ কেউ জাহাজ চালানো শিখছে।

হোটেলের কোন লোক কোনদিন আমার বাবা-মা আছে কিনা বা আমার বাড়ি কোথায় এর কোন কিছু জিজ্ঞেস করেনি। আমিও নিজে থেকে কিছু বলতে যাইনি।

একদিন মাত্র হোটেল ওয়ালা বলেছিলেন,

- "হ্যাঁরে, তোর কি মা-বাবা বেঁচে আছে?"

প্রশ্নটা শুনে আমার পিলে চমকে গেল। কারণ এখন যদি আমি বলি যে, আমার মা-বাবা বেঁচে আছে। তাহলে উনি আরও হয়তো প্রশ্ন করবেন। আমার তখন সব সত্য কোথায় বলতে হবে কেননা আমি প্রতিজ্ঞা করেছি সব সময় সত্য কথা বলব।

তখন মনে মনে বললাম,

- "যা থাকে কপালে। সত্য কথাই বলবো।"

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে তিনি আবার বলে উঠলেন,

- "কিরে, চুপ করে আসিস কেন? তোর মা-বাবা কি বেঁচে নেই?"

আমি তখন ফট করে বলে ফেললাম,

- “হ্যাঁ আছে।”

আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, উনি আমার উত্তর শোনা মাত্র চুপ হয়ে গেলেন। আমাকে আর কোন প্রশ্নই করলেন না। হয়তো উনি বুঝতে পেরেছেন মা-বাবা যখন বেঁচে আছে তখন দরিদ্রতার জন্যই আমি ঘর থেকে বের হয়েছি। আমি আর ওনার সামনে দাঁড়িয়ে না থেকে নিজের কাজ করতে শুরু করে দিলাম। নিজের কাজ ঠিক নয়, পরের কাজ নিজ হাতে করা।

এই হোটেলে ১০ দিন কাজ করলাম ভালো ভাবেই। আমার কাজ দেখে হোটেল ওয়ালা খুবই খুশি হলে।

এতই খুশি হলেন যে, খুশির চটে তিনি বলেই ফেললেন,

- “তোমাকে আরো ১০০ টাকা বেশি অর্থাৎ ৪০০ টাকা বেতন দেয়া হবে।”

ওনার কথায় আমিও খুব খুশি হলাম। তখন আমি আবার দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ শুরু করে দিলাম। কিন্তু হোটেল ওয়ালার বেশি দিন আমার প্রতি খুশি হয়ে থাকতে পারলেন না। একটা ঘটনার পর তিনি আমার প্রতি অখুশি হয়ে গেলেন। সেই ঘটনাটি এবার আপনাদের কৌতুহল দূর করার জন্য উল্লেখ করছি।

একদিন একজন নাবিকের মুখে শুনতে পারলাম, উনার ভীষণ পেটে ব্যথা করছে। তখন উনি খাবার খাচ্ছিলেন। খাবারে প্লেট রেখে দিয়েই চলে গেলেন উনার বাসায়। আর কেউ না বুঝে হোটেলের লোক অর্থাৎ আমরা ঠিকই বুঝেছিলাম কি কারনে নাবিকটার পেট ব্যথা করছিল। আমাদের হোটেলের খারাপ পানি খাওয়ার দরুন ওনার এই অবস্থা হয়েছে। আমার কিন্তু লোকটার জন্য খুবই কষ্ট হচ্ছিল।(আল্লাহ পাক না করুক) অবস্থা যদি খারাপের দিকে মোর নেয়, তাহলে তো তার জন্য আমরাই দায়ী। দোষটা হয়তো আমারই বেশি। কেননা আমি ব্যাপারটা যেও সব লোককে হুঁশিয়ার করে দেইনি। সবাইকে বলে দেইনি যে, এই হোটেলের খাবার পানি খারাপ। হোটেল ওয়ালার ব্যাপারটা দেখেও না দেখার ভান করলেন।

আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ধমকের সুরে উনি বলে উঠলেন,

– “কিরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কাজ কর।”

আমি আর দাঁড়িয়ে না থেকে কাজ করতে লাগলাম।

আরেকদিন অন্য আরেকজন নাবিক হোটেল ওয়ালাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

– “চাচা, আপনার হোটেলের পানি যেন কি রকম। অন্য হোটেলের পানির স্বাদ এক রকম, আর আপনার হোটেলের পানির স্বাদ অন্য রকমের। ব্যাপার কি বলুনতো?”

হোটেল ওয়ালা উনার কথার উত্তরে বললেন,

– “কি করবো বাবু। আজকাল টিউবওয়েলের পানিও খারাপ হয়ে গেছে।”

হোটেল ওয়ালার এই মিথ্যা কথা শুনে আমি আর সহ্য করতে পারলাম না।

ওনার এই মিথ্যা কথার প্রতিবাদ জানিয়ে সবার উদ্দেশ্যে বলে উঠলাম,

– “উনি মিথ্যা কথা বলছেন। আপনারা জানেন না, আপনাদের এই হোটেলে কিসের পানি খাওয়ানো হয়। আপনারা এই হোটেলে পুকুরের পানি খেতে পান।”

আমার এই কথা শোনা মাত্র সব লোক উঠে দাঁড়ালেন।

একজন নাবিক হোটেল ওয়ালাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন,

– “চাচা, আপনাকে আমরা বিশ্বাস করতাম। তাই এই হোটেলে খেতে আসতাম। আজ আপনি আমাদের মাথায় বাড়ি মারলেন।”

হোটেল ওয়ালা বললেন,

– “আমি কিছু জানি না। সব ঐ ছেলেকেই জিজ্ঞেস করে। ওই হয়তো আপনাদের পুকুর হতে পানি খাওয়াতো। কারণ পুকুর টিউবওয়েল থেকে কাছে। কষ্ট এড়ানোর জন্য ও হয়তো তাই পুকুর হতে পানি এনে আপনাদের খাওয়াতো।”

আমি এই কথার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম,

– "মিথ্যা কথা, সব মিথ্যা কথা। আমি পুকুর থেকে পানি এনে খাওয়াবো কেন। আর আমি যদি পুকুরের পানি আপনাদের খাওয়াতিমই তাহলে এই কথা আপনাদের বলে দিতাম না।"

আমার এই কথা সবাই বিশ্বাস করলেন।

তখন একটা লোক বললেন,

– "চাচা, আপনি বুড়ো মানুষ তাই আপনাকে কিছু বললাম না। কিন্তু আমরা কেউ আর আপনার হোটেলে খাব না।"

কথাটা উনি হোটেল ওয়ালাকে উদ্দেশ্য করে বললেন। এই কথা শোনা মাত্র হোটেল ওয়ালা সবার সামনে হাত জড়ো করে দাড়ালেন।

তারপর বললেন,

– "বাবারা আমার খুব অন্যায় হয়েছে, আমি স্বীকার করছি আমার খুব অন্যায় হয়েছে। আমি জেনে শুনে এই কাজ করেছি। আমাকে তোমরা মাফ করে দাও। জীবনে আর এমন কাজ করবো না।"

উনার এই অনুরোধ উপেক্ষা করে সবাই হোটেল থেকে বের হতে লাগলো।

একজন লোক তো বলেই উঠলেন,

– "যে সময় অন্যায় করেছে সে সময়ে মনে ছিল না"

আরেকজন বললেন,

– "ব্যাটা, নিজে তো লাভ করবেই। তার উপর আবার ডাক্তার কেউ লাভবান করবে। আমাদের পুকুরের পানি খাইয়ে নিজে লাভবান হবে। পুকুরের পানি খাওয়ার ফলে আমাদের রোগ হবে। যার ফলে ডাক্তার লাভবান হবে। মাঝখানে থেকে লোকসান হয়ে আমাদের।"

এইরূপে আরও অনেক নানা রকম বিদ্রুপ করতে লাগলো।

তখন একজন নাবিক বললেন,

– "তোমরা চুপ করো। চাচা নিজে থেকে যখন আমাদের কাছে মাফ চেয়েছেন, তখন আমাদের আর ওনার উপর রাগ করা চলে না। এসো আমরা সবাই চাচাকে মাফ করে দেই।"

আরো কয়েকজন লোক ওনারে কথাটিকে সমর্থন করল। শেষ পর্যন্ত সকলে মিলে চাচাকে মাফ করে দিলেন। তখন চাচা আর দেরি না করে পুকুরে যত পানি ছিল, তা সব হোটেলের পিছনে নর্দমায় ফেলে দিতে বললেন।

তারপর আমার হাতে কলস দিয়ে বললেন,

– "যা জলদি টিউবওয়েল থেকে পানি নিয়ে আন।"

ওনার এই কথা শুনে আমি খুব খুশি হলাম। ভাবলাম উনি সত্যি সত্যিই ওরা নিজ ভুল বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু ওনার মনের ভিতরে যে কি ছিল, তা আমি জানতে পারলাম না। সরল মনে ওনার সব কথা মেনে যেতে লাগলাম।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠলাম প্রতিদিন এর চেয়ে আরও সকালে। হোটেলের প্রাথমিক কাজ করার পর যখন সূর্য পূর্ব আকাশে উঁকি দিল, কখন কয়লা দিয়ে দাঁত মাজলাম। তারপর পুকুর হতে হাত-মুখ পরিষ্কার করলাম। কাজও শুরু করে দিলা প্রতিদিনের মত।

কাজ করতে করতে সকাল যখন ৮টা বাজল তখন হোটেল ওয়ালা আমাকে বললেন,

– "তোমার কাজ আমার আর পছন্দ হচ্ছে না। তুমি আজই বরং আমার হোটেল থেকে চলে যাও।"

ওনার কথাগুলো মিছরীর ছুরির মত আমার বুকে এসে বিধলো।

আমি ওনাকে বললাম,

– "একদিন তো আপনি বলেছিলেন আমার কাজ খুব ভালো। যার জন্য আপনি আমাকে ১০০ টাকা বেশিও দিতে চাইলেন। এখন আবার বলছেন আমার কাজ আপনার পছন্দ হচ্ছে না। এ কোন ধরনের কথা।"

– "তখন তোমার কাজ ভালো ছিল। এখন তোমার কাজ খারাপ হয়ে গেছে।"

– "এ আপনি কি বলছেন? আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আমি জানতাম একটা লোকের কাজ প্রথমে খারাপ থাকে তারপর আস্তে আস্তে ভালো হয়। আমার বেলায় কি ঠিক তার বিপরীত হলো?"

– “তুমি আর কথা বাড়িও না। এই নাও ৫০ টাকা। টাকা নিয়ে সোজা তোমার পর তুমি দেখো। আর শোনো যাবার সময় হোটেল থেকে নাস্তা খেয়ে যেও।”

আমি বুঝতে পারলাম কেন উনি আমাকে হোটেল থেকে বিতাড়িত করছেন। তবুও আমি ওনার প্রতি খুশি হলাম। কারণ উনি বললেন যে, যাবার সময় আমি যেন নাস্তা করে যায়। আমি আর ওনার সাথে কথা বাড়ালাম না। ওনার কাছ থেকে ৫০ টি টাকা নিলাম। তারপর হোটেল থেকে নাস্তা খেয়ে কিছুদিনের স্মৃতি বিজড়িত এই হোটেল থেকে বিদায় নিলাম।

কিছুদূর যাওয়ার পর ভাবলাম, হুজুরের কাছে কি একবার যাব? আবার পরক্ষণেই ভাবলাম হুজুরকে অনেক বিরক্ত করেছি আর না। এখন আবার জায়গা বদল করতে হবে। এই ভেবে আবার চলে এলাম পাহাড়পুর রেল স্টেশনে। সেখান থেকে ঢাকাগামী একটা ট্রেনের ছাদে উঠে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর এই ট্রেন ছেড়ে দিল।

15

টঙ্গী রেল স্টেশন

আস্তে আস্তে ট্রেনের গতি বাড়তে লাগলো। এক সময় দেখলাম ট্রেন দ্রুত গতিতে চট্টগ্রামকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। আমি শেষবারের মতো চট্টগ্রামের সৌন্দর্য ভালোভাবে দেখে নিলাম।

রাত ১০টার সময় ট্রেনটি টঙ্গীতে পৌঁছালো। আমি আর সামনের দিকে গেলাম না। টুঙ্গিতেই নেমে পড়লাম। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম আর মাত্র ৩০ টা টাকা রয়েছে। বাকি ২০ টাকা খাওয়ার জন্য ব্যয় হয়েছে। আমি আর টাকার কথা চিন্তা করলাম না। চিন্তা করতে লাগলাম, স্টেশনে ঘুমাবার মত কিভাবে একটা জায়গা পাওয়া যায়। আমি দেখলাম চিন্তায় কোন কাজ হবে না, আমাকে চেষ্টা করতে হবে। তাই আমি চেষ্টা করে দেখতে লাগলাম কোন জায়গা পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু আমার চেষ্টায় বৃথা হল। স্টেশনে এত পরিমান লোক শুয়েছিল যে তাতে তিল ধারণের স্থান হয়তো হতে পারে কিন্তু মানুষ ধারণের স্থান কোথাও নেই। অনেক কষ্ট করার পর একটা জায়গা পেলাম, যার উপরে খোলা আকাশ। অর্থাৎ তাতে কোন ছাউনি ছিল না। তবুও এইরকম একটা জায়গা পেয়েছি তাই ভাগ্য। আমি আর দেরি না করে গায়ের গামছা খানি দিয়ে ধুলা-বালি সরিয়ে ফেললাম। তারপর গামছাটা পেতে তার উপর শুয়ে পড়লাম। পিটের নিচের উচু অংশ গুলো আমাকে খুব কষ্ট

দিচ্ছিল। কারন আমার শোয়ার জায়গাটা ছিল অসমান। তবুও বাধ্য হয়ে কষ্ট করতেই হবে। কেননা এর চাইতে ভালো জায়গা খালি নাই।

আকাশে তখন অসংখ্য তারা উঠেছিল। আমি এক দৃষ্টিতে আকাশের পানে চেয়ে রইলাম। শোয়ার স্থানটা কষ্টদায়ক হলেও, আকাশের পানে চেয়ে আমার মনটা একটু স্বস্তি পেল। আকাশের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে কখন নিজের অজান্তে ঘুমিয়ে পড়লাম তা টেরও পেলাম না।

ঘুম থেকে উঠলাম খুব সকালে। তারপর হাত-মুখ পরিষ্কার করে নিলাম। কিছুক্ষণ স্টেশনে বসে থাকার পর যখন মনে করলাম এখন দোকান-পাট খোলা শুরু হয়েছে তখন স্টেশন থেকে বের হলাম। উদ্দেশ্য কোন কাজ পাবার। কিন্তু ভাগ্য আমার প্রতি নির্দয় হলো। কোন কাজ খুঁজে পেলাম না। এমনকি দুইদিন খোঁজা-খুঁজির পরও কোন কাজ আমার হাতে এল না। পকেট তখন আমার একেবারে শূন্য। এই দুই দিনে খাওয়ার জন্য ৩০ টাকা খোয়া গেছে। আমি ভাবনায় পড়ে গেলাম। এখন কি করা যায়? ভাবনাটা জোর করে মাথা থেকে সরিয়ে ফেললাম। কেননা এখন আমার ভাবার সময় নেই। আমাকে যে করেই হোক একটা কাজ খুঁজে বের করতেই হবে। এই ভেবে আবার কাজ খোঁজা শুরু করে দিলাম। কিন্তু রাত ৮টা পর্যন্ত কাজ খুঁজেও কোন কাজ পেলাম না। তখন তখন ভগ্ন প্রায় মন নিয়ে স্টেশনে চলে এলাম। আমার ভাগ্য ভালো স্টেশনে আসার সাথে সাথে ঘুমাবার জন্য একটা সুন্দর জায়গা পেয়ে গেলাম। সুন্দর জায়গা মানে আপনারাই তো বুঝতে পারছেন। আমি আর সময় নষ্ট করলাম না। গায়ের গামছাখানা বিছিয়ে তার উপর শুয়ে পড়লাম। কাজটা যথা সম্ভব তাড়াতাড়িই করলাম। কারণ দেরি করলে হয়তো জায়গাটা অন্য কোন লোকে দখল করে নেবে। আর একবার যদি তারা জায়গাটা দখল করতে পারে তাহলে তা আর সহজে ছাড়বে না। এই স্টেশনে জায়গা পেতে হলে সন্ধ্যা থেকে চেষ্টা করতে হয়। আজ ভাগ্য ভালো তাই জায়গাটা পেতে বেশি কষ্ট করতে হয়নি। তাও যদি হেলায় নষ্ট করি, তাহলে আর কোন উপায় থাকবেনা। ভালো জায়গা পেয়ে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে গেলাম।

ঘুম থেকে উঠে স্টেশনের পাশে সেই কল হতে হাত-মূখ পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে বের হলাম। হাত-মূখ পরিষ্কার করে স্টেশনের ভিতরের একটা বেঞ্চে এসে বসলাম। কিছুক্ষণ পর দেখলাম একটা ট্রেন এসে স্টেশনে থামলো। ট্রেনটি থামার সাথে সাথে অনেক লোক ছুটে দৌড়ালো ট্রেনটিতে ওঠার জন্য। তাদের অনেকের সাথেই ছিল দড়ি। আমি জানতাম তারা এই দড়ি দিয়ে কি করবে। টঙ্গীর ও দূরে রামপুর, মধুপুর প্রভৃত শালবন এলাকায় গিয়ে খড়ি বা জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে। তারপর তা বিক্রি করার পর যে দুই-চার পয়সা তাদের আয় হয়, তাতে তাদের মোটা-মুটি ভাবে খাওয়ার খরচটা চলে। আমি ঠিক করলাম আমিও ওদের সাথে যাব।

মনে মনে এই ঠিক করে আমি ট্রেনের সাথে উঠে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর ট্রেনটি ছেড়ে দিল। এক সময় ট্রেনটি শালবন এলাকায় ঢুকে পড়ল। চারদিকে চেয়ে দেখলাম শুধু গাছ আর গাছ। গাছকে আমি চিরকালই ভালবাসতাম। তাই এত ঘন গাছ দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। মনে মনে ঠিক করলাম আমিও এই দেশকে গাছে গাছে ভরে তোলার একটা বাস্তব পদক্ষেপ নেব। আমি শালবনের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে এক সময় অনুভব করলাম ট্রেনের গতি আস্তে থেমে যাচ্ছে। বুঝতে পারলাম ট্রেন এখন থামবে।

16

রাজেন্দ্রপুর শালবন

যখন ট্রেন রাজেন্দ্রপুর থামলো, তখন অনেকেই ট্রেন হতে নেমে পড়তে লাগলেন। তাদের ভিতরে যারা খড়ি নিতে এসেছেন তারাও আছেন। আমি আর বিলম্ব করলাম না। ওনাদের(যারা খড়ি নিতে এসেছে) পথ অনুসরণ করে নেমে পড়লাম। নেমে দেখতে পেলাম, পাঁচটি আমার বয়সী ছেলে দড়ি হাতে নিয়ে রাজেন্দ্রপুর শালবনের ভিতরে ঢুকছে। আমি আর বিলম্ব না করে ওদের পেছনে পেছন চলতে লাগলাম। আমি যে ওদের পিছন পিছন চলছি তা ওরা টেরি পেল না। অনেকক্ষণ পর আমি ওদের নজরে পড়লাম।

তখন একটা ছেলে আমাকে প্রশ্ন করল,

– “তুমি যাবে কোথায়?”

আমি উত্তর দিলাম,

– “তোমরা যেখানে যাচ্ছ, সেখানে।”

– “আমরা তো যাচ্ছি খড়ি আনতে।”

– “আমিও যাচ্ছি সেখানে।”

– “কিন্তু তোমার দড়ি কৈ?”

– “দড়ি নাই।”

– “তবে কি করে খড়ি নেবে।”

– “কেন, কলা গাছের কোষ্টা* দিয়ে”

কোষ্টা* হল কলা গাছের একটা অংশ। যার সাহায্যে দড়ির কাজ করা যায়।

– “তাহলে তুমি আমাদের সাথে যেতে পারো।”

আমি ওদের সাথে চলতে লাগলাম। পেটে তখন প্রচন্ড ক্ষিদে। ক্ষিদেকে সরিয়ে দিলাম দূরে, কষ্টকে নিয়ে এলাম কাছে। অর্থাৎ আমি কষ্ট সহ্য করেই পথ চলতে লাগলাম। এছাড়া অন্য কোন উপায়ের দরজা আমার জন্য খোলা ছিল না। মনকে সান্ত্বনা দিলাম এই বলে যে, যদি খড়ি নিয়ে বিক্রি করতে পারি তাহলে সেই টাকা দিয়ে কিছু কিনে খেতে পারব। আমার মনে সন্দেহ ছিল, খড়ি নিয়ে বাইরে বিক্রি করতে পারব কিনা।

আমি এদের দলে আসায় মোট ছয় জন হলাম। ছয়টি ছেলে প্রায় একই বয়সে। কিন্তু কারো সাথে এর আগে আমার পরিচয় হয়নি। ওদেরকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, ওরা আরো অনেকবার এই বনে খড়ি নিতে এসেছে। কিন্তু আমি এলাম জীবনে এই প্রথম। তাই এত গভীর মন দেখে আমার ভয় ভয় করতে লাগলো। ওদের দিকে চেয়ে দেখলাম, ওরা নির্বিঘ্নে হেটে যাচ্ছে। তাই আমার ভয়ও কিছুটা কমে গেল। বনে শাল গাছগুলো এত ঘন হয়ে জন্মেছে যে, দিন হওয়া সত্য সবকিছু ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে ধান ক্ষেতের উপরে খোলা আকাশ থাকায় সেখানেই মাত্র সূর্যের আলো এসে পড়ছে। ওদের কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম ধানক্ষেতের জমিগুলো এখানকার স্থানীয় লোকেদের। অর্থাৎ এই বলে যে স্বল্প কয়জন লোক বাস করে তাদের। আমি ও আমার সাথে ছেলেরা বনের ভেতর শরু রাস্তা দিয়ে হাঁটছি আর আমি ওদেরকে নানা রকম প্রশ্ন করে ব্যাতি ভ্রান্ত করছি। রাস্তার(সরুপথ) দুই পাশেও ছিল উঁচু উঁচু শাল গাছ। কিছুদূর হাঁটার পর এখানকার স্থানীয় লোকদের লাগানো একটা কলাগাছ হতে কিছু কোষ্টা ছাড়িয়ে নিলাম। তারপর আবার চলতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পর ওরা খড়ি সংগ্রহ করতে লেগে গেল। ঝড়ে যেসব শাল গাছের ডাল-পালা পড়ে গেছে, অথবা কোন লোক গাছ কেটে শুধু কান্ডটা নিয়ে গেছে আর ডাল-পালা রেখে গেছে, আমরা এমনই সব খড়ি জোগাড়

করতে লাগলাম। আমার পেটের অবস্থা তখন শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। আমি আর ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে পারছিলাম না। তবুও অনেক কষ্ট করে সহ্য করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর খুদার জ্বালায় আমার মাথা ঘুরতে লাগলো।

তখন সাথের ছেলেদের উদ্দেশ্য করে বললাম,

- "আমার খুব ক্ষিদে লেগেছে। এখন উপায় কি?"

একটা ছেলে বলল,

- "কি আর করবে, সহ্য করে যাও।"

- "সহ্য যে আর করতে পারছি না।"

- "সত্যিই কি তোমার খুব ক্ষিদে লেগেছে?"

- "হ্যাঁ সত্যিই খুব ক্ষিদে লেগেছে।"

- "তাহলে তুমি খড়ি খোজা বাদ দাও। দেখো ধারে কাছে কোথাও ঘর-বাড়ি পাও কিনা। এখানকার লোকজন খুবই ভালো। তুমি তোমার সমস্যার কথা জানালে তারা নিশ্চয়ই তোমাকে কিছু খেতে দেবে।"

এই বলে সে আমাকে একটা পথ দেখিয়ে দিল। আমি আর দেরি না করে সে পথে রওনা দিলাম।

আমি হাঁটছি তো হাঁটছিই। কিন্তু কোথাও কোন ঘর-বাড়ি দেখতে পেলাম না। শুধু গাছ আর গাছ। গাছ আমার কাছে এত প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও এই সময় সে আমার কাছে অপ্রিয় হয়ে গেল। কারণ হলো আমার পেটে এখন প্রচন্ড ক্ষিদে। আমার মনে পড়ে গেল ডব্লিউ সি ব্রানের একটি উক্তির কথা।

তিনি বলেছেন,

- "খালি পেটে কেউ কোনদিন স্বদেশ প্রেমিক হতে পারে না।"

আমার ক্ষেত্রে বাক্যটা এভাবে প্রযোজ্য,

- "খালি পেটে কেউ কোনদিন সৌন্দর্য প্রিয় হতে পারে না।"

আনুমানিক এক মায়ের মত হাঁটার পর দূরে বাড়ির মতো কিছু একটা দেখতে পেলাম। আর কিছুদূর যেতেই সত্যি সত্যি আমি বুঝতে পারলাম ওটা একটা বাড়ি। মরে যাওয়ার পর আমি আমার প্রাণ ফিরে পেয়েছি, এমনভাবে

লাফিয়ে উঠলাম। আরো জোরে জোরে পা চালিয়ে, বলতে গেলে একরকম দৌড়াতে দৌড়াতেই বাড়িটার কাছে গেল। বাড়ির সামনে দেখতে পেলাম একটা টিউবওয়েল। আমি তাড়াহুড়ো করে টিউবওয়েল থেকে কিছু পানি খেয়ে নিলাম। খালি পেটে পানি খাওয়ার দরুন মাথাটা আরো বেশি ব্যাথা করতে লাগলো। আমার বয়সী একটা ছেলেকে দেখতে পেলাম বাড়ির সামনে একটা গাছ তলায় দাঁড়িয়ে আছে।

আমাকে দেখামাত্র এসে বলে উঠলো,

– "তুমি কে, এখানে কি জন্য এসেছ?"

আমি ওর কথার উত্তর দিলাম এই বলে,

– "আমি এই বলে এসেছিলাম খড়ি জোগাড় করার জন্য। কিন্তু গতকাল থেকে কিছু না খাওয়ার দরুন আমার শরীর ছিল খুবই ক্লান্ত। তাই আমার আর খড়ি জোগাড় করা হলো না। আমার সাথে ছেলেরা একটা পথ দেখিয়ে বলল আমি কোথাও কোন বাড়ি পেলে বাড়ির লোকের কাছে আমার সমস্যার কথা বললে তারা কিছু খেতে দেবে। সেই ভরসাতেই এখানে এসেছি। ক্ষিদের জ্বালায় আমার মাথা ব্যথা করছে।"

– "তুমি এখানে দাড়াও, আমি এখনই আসছি।"

এই বলে সে বাড়ির ভিতরে চলে গেল। আমি সেই গাছ তলায় বসে পড়লাম। দাঁড়াবার শক্তি টুকুও আমার দেহে অবশিষ্ট ছিল না। কতক্ষণ বসে থাকার পর ওই ছেলেটিকে আমার কাছে আসতে দেখলাম। তার হাত দেখতে পেলাম কয়েকটা রুটি আর এক প্লেট ভাজির মত কিছু একটা জিনিস।

আমার কাছে এসে ও বললো,

– "এই রুটি কয়টা খেয়ে নাও।"

আমি তার সাথে কথা না বাড়িয়ে রুটি কয়টি খেতে শুরু করে দিলাম। আমার কাছে খাবার দিয়ে ওই ছেলেটি আবার যেন কোথায় চলে গেল।

আমার যখন খাওয়া শেষ হল, তখন ও আবার আমার সামনে কয়েকটি পেয়ারা ধরে বলল,

– "এ গুলি খাও।"

আমি পেয়ারাগুলো হাতে নিয়ে বললাম,

– "পেয়ারা পেলে কোথায়?"

– "আমাদের গাছের পেয়ারা।"

আমি পেয়ারার কামড় বসিয়ে দিয়ে বললাম,

– "খুব মিষ্টি পেয়ারা তো।"

– "এ আমার নিজের হাতে লাগানো গাছের পেয়ারা।"

– "তাই নাকি।"

– "হ্যাঁ। তোমাকে কি আরো কয়েকটা পেয়ারা এনে দেবো?"

– "না থাক, অনেক হয়েছে।"

– "না, আমি বুঝতে পারছি। তোমার এখনো ক্ষিদে মেটেনি। আমি বরং আর কয়েকটা পেয়ারা নিয়ে আসি।"

এই বলে সে আবার চলে গেল। কিছুক্ষণ পর নিয়ে এলো লুঙ্গি ভর্তি করে পেয়ার।

আমি বললাম,

– "এত পেয়ারা দিয়ে কি করব।"

– "কি আর করবে, খাবে।"

– "এতগুলো খাবো আমি। না এ আমি পারবো না।"

– "তোমাকে পারতেই হবে।"

– "না পারবো না।"

– "পারতেই হবে।"

– "দেখো আমার পেট ভরে গেছে। আর অল্প কিছুও খেলে আমার পেট ফেটে সবকিছু বের হয়ে আসবে।"

– "তবুও তোমাকে ক্ষেতে হবে।"

অগত্যা কি আর করা। সে নাছোড় বান্দা ছেলের হাতে পড়েছি তাতে আর না খেয়ে পারা যাবে না। তাই বাধ্য হয়েই এক একটা পেয়ারা খেতে লাগলাম। না, আমি নিজে নই, ওই আমাকে খাওয়াতে লাগলো।

কারণ যেখানে আমার মুখ বলছে,

– “না না, আর না।”

তখনও বলছে,

– “হ্যাঁ হ্যাঁ, আরও খাও।”

তখন আমি নিজ থেকে খেলেও বুঝতে হবে, ওই আমাকে খাইয়ে দিচ্ছে। এমনিভাবে সব পেয়ারায় আমাকে খাইয়ে ছাড়লো।

সব পেয়ারা গুলো খাওয়ার পর ও বাড়ির ভিতর থেকে একটা পার্টি এনে বলল,

– “এখানে বসে বিশ্রাম নেও।”

আমি ওকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম। বুঝতে পারলাম, ছেলেটি নাছোড়বান্দা হলেও উপস্থিত জ্ঞান আছে। এই সময়ে যে আমার বিশ্রামের প্রয়োজন তা ঠিক ও বুঝতে পারল। আমি আর দেরি না করে পার্টিতে বসে পড়ে একটা গাছের সাথে হেলান দিলাম। কিছুক্ষণ পর বাড়ির ভিতর থেকে কয়েকজন বয়স্ক মহিলা এলেন। ওনারা এসে একের পর এক প্রশ্ন করে চললেন। আমার ভাগ্য ভালো যে, উনারা এমন কোন প্রশ্ন করলেন না, যাতে আমার মিথ্যা কথা বলতে হয়। সুতরাং ওনাদের সব প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারলাম।

আমাকে যে ছেলেটি খাবার দিয়েছিল, সে একসময় কথার প্রসঙ্গে আমার কাছে জানতে চাইলো,

– “তুমি কি কোন কাজ করবে?”

আরে উল্টো ওকে আবার জিজ্ঞেস করলাম,

– “কি ধরনের কাজ।”

– “এই ধরো কি গৃহস্থের কাজ।”

– “হ্যাঁ করব। কিন্তু কোথায়?”

– “আমার পরিচিত এক গৃহস্থের একটা লোকের প্রয়োজন ছিল। তোমাকে যখন পেয়েছি, তখন তোমাকে বরং তার কাছে নিয়ে যায়। কি বলো?”

– “তাতে আমার কোন আপত্তি নাই।”

– "তাহলে দুপুরে খাওয়ার পর কিছুটা সময় বিশ্রাম নিয়ে ধীরে সুস্থে রওনা দেওয়া যাবে।"

– "ঠিক আছে।"

– "তুমি কি আজ গোসল করেছ?"

– "না।"

– "তুমি এখানে দাড়াও। আমি তোমার জন্য লুঙ্গি আর গামছা নিয়ে আসি।"

এই বলেছে আমাকে ধার করিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর একটা লুঙ্গি আর একটা গামছা নিয়ে ফিরে এলো।

আমাকে ওগুলো দিয়ে বলল,

– "এই নাও লুঙ্গি আর গামছা। আমার সাথে আসো। তোমাকে পুকুরটা দেখিয়ে দেই।"

আমি ওর সাথে যেতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর ও আমাকে পুকুর দেখিয়ে বলল,

– "এখানে গোসল করে নাও। আর সাবধানে ঘাটে নেব। তা নইলে পিছলে গিয়ে হাত-পা ভেঙ্গে ফেলবে।"

এই বলে সে একটা গাছ তলায় দাঁড়িয়ে রইলো। যখন আমার গোসল করা শেষ হলো তখন সে আমাকে ওদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল। তারপর দুজনে মিলে অনেক ধরনের গল্প করলাম। যখন দুপুরে খাওয়ার সময় উপস্থিত হলো, তখন মেয়েদের কন্ঠে কে যেন বলে উঠলো,

– "নাসির ঐ ছেলেটিকে নিয়ে খেতে আয়।"

আমি বুঝতে পারলাম আমার সাথের ছেলেটার নাম নাসির। এই কথা শোনা মাত্র সেই আর দেরি করল না। আমাকে নিয়ে গেল অন্য আরেকটা ঘরে। কিছুক্ষণ পরে আমার সামনে খাবার হাজির করা হলো।

খাওয়া-দাওয়ার পর ঐ ছেলেটি আমাকে একটা বিছানায় শুয়ে দিল। ওর কান্ড কারখানা এমন যে, আমি ভীষণ অসুস্থ। তাই ও আমার সেবা সুস্থতা করছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর ওর সাথে সেই গৃহস্থ পরিবারের

উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সেখানে পৌঁছানোর পর ও বাড়ির কর্তার কাছে আমাকে হাজির করল। বাড়ি কর্তাকে ও বলল,

– "চাচা এই ছেলেটি কাজ করতে চায়। আপনি বলেছিলেন না, আপনার কাজের লোকের দরকার। তাই একে নিয়ে এসেছি।"

কর্তা অনেকক্ষণ ধরে আমাকে দেখলো। তারপর জিজ্ঞেস করলেন,

– "আগে কোনদিন গৃহস্থের কাজ করেছ?"

আমি উত্তর দিলাম,

– "জ্বি, না।"

– "এ কাজ সহ্য করতে পারবে তো।"

– "হ্যাঁ পারব।"

– "আপাতত তোমাকে আমি পেটে-ভাতে* রাখলাম। কিছুদিন কাজ করার পর যদি কাজ শিখতে পারো তাহলে তোমাকে বেতন দেয়া হবে। তুমি কি এতে রাজি?"

পেটে-ভাতে* হলো কাজের বিনিময়ে শুধুমাত্র খাওয়া আর পোশাক। বেতন নাই।

– "হ্যাঁ, আমি রাজি।"

– "তাহলে আমার কাছে তুমি থাকতে পারো।"

তারপর আমার সাথে ছেলেটাকে উদ্দেশ্য করে বলল,

– "নাসির, তুই কিন্তু চলে যাইসনে। কতদিন পর এসেছিস একদিন বেড়ায়ে যাইস।"

নাসির বলল,

– "না চাচা, বাড়িতে অনেক কাজ পড়ে আছে। আমি না গেলে আর একটা কাজও আগোবে না।"

এই বলে নাসির রওনা দিল। কর্তা ওকে যেতে দেখে বলে উঠলেন,

– "সে কিরে। এখনই যে যাচ্ছিস। কতদূর থেকে এসেছিস একটু জিরিয়ে যা।"

- "না চাচা, আজ আর জিরোবার সময় নেই। আর একদিন এসে জিরিয়ে যাবানে।"

এই বলে সে চলে গেল। আমি ঠাই পেলাম।

17

শালবন

সেদিন আমার কোন কাজ করতে হলো না। কারণ দিন তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বাড়ির কাছা-কাছি ঘোরা-ঘুরি করে দিনের বাকি অংশটুকু কাটিয়ে দিলাম। রাতের খাবার সময় হলে আমাকে খেতে দেয়া হলো। খাবার খেয়ে বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। পা দুটি অবশ্য বাড়ির লোকেরাই দিলেন। শোয়ার অল্প কিছুক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম থেকে উঠে বাড়ির পুকুর থেকে হাত-মুখ পরিষ্কার করলাম। তারপর কর্তার সাথে চলে গেলাম মাঠে কাজ করতে।

জীবনে কোনদিন মাঠের কাজে হাত দেয়নি। তাই আমার কাছে এই কাজটি প্রথমে খুবই কষ্টের কাজ বলে মনে হল। কিছুক্ষণ কাজ করার পর কষ্টটা একটু কমলো। প্রথম দিন আমার কাজ ছিল কোদাল দিয়ে ক্ষেতের চারি-পাশ পরিষ্কার করা। আমি আমার কাজ করে যেতে লাগলাম। যখন সকালের খাবার সময় হল, তখন বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে হাজির হলেন কর্তার এক মাত্র ছেলে। ওর নাম এখন অবশ্য আমার মনে পড়ছে না।আমরা খাবার পেয়ে খুব খুশি হলাম। বিশেষ করে আমি। হাত-মুখ বাড়ি থেকে আনা জগের পানির সাহায্যে পরিষ্কার করে ফেললাম। তারপর খেতে বসলাম। খাওয়া শেষ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবারও কাজ করা শুরু করে দিলাম। কিছুক্ষণ পর রোদ্রের তাপ প্রচণ্ড পরিমাণে বেড়ে গেল। রুদ্রের তাপে

আমার শরীর থেকে এক নাগাড়ে ঘাম করতে লাগলো। তবুও আমাকে বাধ্য হয়ে সব সহ্য করে কাজ করে যেতেই হবে। তাই কষ্ট সহ্য করে কাজ করে যেতে লাগলাম। যখন দুপুরের খাবার সময় হল তখন আমি আর কর্তা বাড়ি গেলাম। তারপর পুকুর থেকে গোসল করে নিলাম। আমার অতিরিক্ত কোন লুঙ্গি ছিল না। তাই ওনার একটা লুঙ্গি আমাকে করতে দিলে। গোসল করার পর আমাকে খাবার দেওয়া হল। খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার মাঠে চলে এলাম। ওর তো আমার সাথে এলেন না। কারণ, তখন সূর্যের প্রচণ্ড তাপ ছিল। তাই সেই তাপে রক্তমাংসে গড়া মানুষের কাজ করা খুবই কঠিন। কর্তা হয় তো ভেবেছেন আমি রক্তে মাংসে গড়া মানুষই না। তাই আমাকেই পাঠিয়ে দিলেন মাঠে কাজ করার জন্য। আমি আর কি করবো। যখন ওনার কাজ করছি তখন ওনার কথা শুনতেই হবে।

নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে আমি আমার বাকি কাজটুকু শেষ করতে লাগলাম। যখন সূর্যের তাপ কমলো, তখন কর্তা মাঠে এসে হাজির হলেন। কিন্তু কোন কাজ করলেন না। আমাকে শুধু একটা এটা কর, ওটা কর ইত্যাদি বলে কাজ করা নির্দেশ দিচ্ছিলেন। আমিও ওনার নির্দেশ মোতাবেক কাজ করে গেলাম। কাজ করতে করতে একসময় সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ল। তখন কর্তা আমাকে কাজ বন্ধ করতে বললেন। আমি কাজ বন্ধ করে কর্তার সাথে বাড়ি চলে এলাম। তারপর খাবার সময় হলে গত দিনের মতো খেয়েদেয়ে আবার বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। শোয়ার অল্প কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়েও পড়লাম। আজ ঘুমটা একটু তাড়াতাড়িই হল। কেননা সারা দিনটা গেছে খাটুনির উপর।

ঘুম থেকে উঠে কত দিনের মতো হাত-মুখ পরিষ্কার করে কর্তার সাথে আবার কাজের জন্য মাঠে চলে গেলাম। আমার আজকের কাজ হল লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করা। আরে জীবনে কোনদিন লাঙ্গল হাতে ধরিনি। তাই লাঙ্গল ধরার সাথে সাথে আমার মনের ভিতর কেমন কেমন যেন করতে লাগলো। কর্তা ছিলেন আমার সামনে। উনি আর একটা লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করে চলছে। পূর্বেই কর্তা আমার জোয়াল কি করে দিয়েছিলেন। তা

আমি আর বিলম্ব না করে ওনার পিছন পিছন লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করে চললাম। কিছুক্ষণ পর একটা ছেলেকে দেখতে পেলাম খাবার নিয়ে আমাদের এ দিকেই আসছে। আমি বুঝতে পারলাম যে, ঐ ছেলেটাই কর্তারই একমাত্র ছেলে। ও যখন আমাদের কাছে এলো, তখন কর্তা আমাকে কাজ বন্ধ করতে বললেন। আমি কাজ বন্ধ করে ওনার সাথে হাত-মুখ পরিষ্কার করে খেতে বসলাম। আমরা খেতে বসলাম একটা গাছ তলায়। বাইরে বসে খাওয়ার একটা অন্যরকম তৃপ্তি আছে। সাধারণ খাওয়াকেও অনেক স্বাদের মনে হয়। তাই সাধারণ ডাল-ভাত খেয়েও আমার মনে হল আমি যেন বেহেস্তের খাবার খাচ্ছি। আমি বুঝতে পারলাম জিব্বাই শুধু স্বাদ পরক করে না। স্বাদ বড় করার জন্য আরো একটি জিনিস রয়েছে। যার নাম মন। এই মনের কারনেই স্বাভাবিক খাবার আমার কাছে এত সুস্বাদের এর মনে হতে লাগলো। কারণ আমি যেখানে বসে খাবার খাচ্ছি তার চারপাশে মনের জন্য অনেক সুস্বাদু খাবার রয়েছে। এই মনের খাবারের জন্যই জিব্বার খাবারকে আমার কাছে সুস্বাদু মনে হল।

খাওয়া-দাওয়া শেষে আমরা আবার জমির চাষ শুরু করে দিলাম। এবারও আমি কর্তার পিছন পিছন জমে চাষ করে চললাম। এই সময়ে একটা হাস্যকর ব্যাপার ঘটল। পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণের নিমিত্তে এবার এই ঘটনাটি উল্লেখ করছি।

আমি করতো আর পিছন পিছন জমির চাষ করে চলছি। হঠাৎ আমার জোয়ালের গরু দুটো আমার কথা না মেনে লাঙ্গল শুদ্ধ জমি থেকে জঙ্গলের মধ্যে উঠে গেল। আমি কর্তার পিছন পিছন ছিলাম বলে কর্তা এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করলেন না। মোর ঘুরতে যখন তিনি দেখলেন, আমি ওনার পিছনে নেই, তখন খুব ঘাবড়ে গেলেন। বিড়বিড় করে কি যেন পড়ে বুকে ফু দিলেন। তারপর আমার নাম ধরে ডাক দিলেন। আমি সারা দেওয়ার পর আমার গরু দুটোর সহ জঙ্গল থেকে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন।

তারপর আচ্ছা করে একটা ধমক দিয়ে বললেন,

– "যে সময় গরু দুটো জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছিল সেই সময় তুমি আমাকে ডাক দিলে না কেন?"

– "বারে, আমি তখন গরু দুটো ঠেকাবো না আপনাকে ডাক দেব।"

– "আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। এ স্রেফ শয়তানের কাজ।"

– "কি যে বলেন, এই বলে শয়তান আসবে কোত্থেকে?"

– "তুমি কি কচি খোকা নাকি। জানোনা এই মনে শয়তান আসবে কোত্থেকে। এই বনেই তো শয়তান বেশি।"

– "আমি কিন্তু ভাই শয়তান বিশ্বাস করিনা।"

– "তা করবা কেন, খাঁটি মুসলমান হলে ঠিকই করতে।"

আমি বুঝতে পারলাম উনার সাথে কথা বলে কোন লাভ হবে না। তাই তখন কার মত চুপ করে রইলাম।

সেদিনের জন্য কর্তা এই পর্যন্তই কাজের রীতি টানলেন। আমি বুঝতে পারলাম ভয়ের কারণেই তিনি এমনটি করলেন। বাড়ি এসে উনি সব লোকের কাছে আজকের এই ঘটনাটি ফোলাও করে প্রচার করলেন। সেই কথাটি শুনে সবারই হাসার কথা। কিন্তু তারা একটুও হাসলেন না। বড় ঘটনা শুনে আরও ভয় পেয়ে গেলেন। কর্তা নিজে গিয়ে একটা ফকির মত লোককে কোথা থেকে যেন নিয়ে এলেন।

ফকির কে বললেন,

– "বাবা, আপনার দোয়াতে এই বোনের শয়তানের শয়তানি একটু কমে ছিল। আবার তার উৎপাত বেড়েছে।"

ফকির এক ঝংকার দিয়ে বলে উঠলেন

– "কুচ পড়ুয়া নেই। এখনই আমি এই বোন থেকে শয়তান তাড়িয়ে দিচ্ছি।"

এই বলে তিনি নানারকম ভঙ্গিতে কি যেন সব বলতে লাগল। ওনার কান্ড কারখানা দেখে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ উনি ওনার মন্ত্র পাঠ করে বললেন,

– “আর কোন ভয় নেই। চিরদিনের মত শয়তান এই বোন থেকে তাড়িয়ে দিলাম।”

তখন সবার মুখ হাসিতে ভরে গেল। কর্তা ফকিরকে কিছু টাকা দিয়ে বললেন,

– “চলেন আপনাকে আমি এগিয়ে দিয়ে আসি।”

– “তাই চলো, বাবা।”

পর্দা তখন ফকিরের সাথে বাড়ির বাইরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি একা বাড়িতে এলেন। আমি বুঝতে পারলাম না সাধারণ একটা ব্যাপারকে এত বড় করে দেখার কি মানে হতে পারে। সেদিন আমার কোন কাজই করতে হলো না। না, না কাজ ছিল। সে কাজ হল সবার কাছে আজকের ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া। আজ আমার ঘুমটা একটু দেরিতেই হলো। কারণ রাত্রেও ওদের কাছে আমার বলতে হয়েছিল আজকের ঘটনাটির কথা।

কিছুদিন কর্তার এখানে কাজ করার পর যখন মোটামুটি কাজ শিখলাম তখন করতো একদিন বললেন,

– “হ্যাঁরে, তোরে একটা লোকে কাজে নিতে চায়। বছরে ১৫০০ টাকা। তুই কি এতে রাজি।”

আমি সম্মতি দিলে উনি আমাকে সেই লোকটির কাছে নিয়ে গেলেন। সে লোকটা কর্তার চেয়ে বয়সে কিছু ছোট। কর্তা আর ওনার কথাবার্তার মাধ্যমে আমি বুঝতে পারলাম, উনার নাম রবিউল। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,

– “তোমার নাম কি?”

– “মনির।”

– “বাড়ি কোথায়?”

– “বরিশাল।”

– “বাবা-মা আছে?”

আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করে উত্তর দিলাম,

– “হ্যাঁ আছে।”

– “বাবা কি করেন?”

– “চাকরি করেন।”

– “তাহলে তুমি এ কাজ করতে এলে কেন?”

আমি অনেকক্ষণ ভেবে-চিন্তে উত্তর দিলাম,

– " জ্বি, বাবার চাকরিটা অতি সামান্য তাই।”

উনি আমাকে আর কোন প্রশ্ন করলেন না। পাঠকগণ আপনারা হয়তো আমাকে বলবেন, আমি মিথ্যাবাদী। কিন্তু আমি মিথ্যা কথা বলিনি। অতি কষ্টে সত্যকে গোপন রেখেছি মাত্র। আমার বাবার চাকরিতে আমাদের পরিবারের সকলের খেয়েদেয়ে খুব ভালোভাবে চলে যায়। তবুও এমন লোক আছে যারা আমার বাবার চেয়েও বড় চাকরি করেন। আমার এমন লোক আছেন যারা আমার বাবার থেকেও ছোট চাকরি করেন। যারা আমার বাবার চেয়েও বড় চাকরি করেন, তাদের কাছে হয়তো আমার বাবার চাকরি টা অতি সামান্য। আমি সেই দিক দিয়ে ওনার কথার উত্তর দিলাম। তাই বলে আমার বাবার চাকরির থেকেও যারা ছোট চাকরি করেন, তাদেরকে আমি বলেছিনে যে তাদের চাকরিটা অতি সামান্য। বরং তাদের চাকরি আমার বাবার চাকরি থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সে যাই হোক আমাকে উনি কাজে নিলেন বছর হিসাবে। প্রতিবছর ১৫০০ টাকা। কাপড়, খাওয়া-দাওয়া ওনার খরচে। কিন্তু আমি জানতাম যে, আমার এই দীর্ঘ একটা বছর ওনার এখানে কাজ করা হবে না। কারণ আমি বাসা থেকে বের হয়েছিলাম কয়েক দিন এই দেশ দেখার জন্য। তার মানে এই না যে, আমি আমার পড়াশোনার ইতি টেনে জীবনটাকে বরবাদ করে দেব। তাই একদিন ঠিক করে ফেললাম রবিউল ভাইকে সব কথা বলব। ওনাকে আমি রবিউল ভাই বলেই সম্বোধন করতাম।

পরে দিন আমার সব কথা উনাকে খুলে বললাম। উনি খুব ভালো মানুষ ছিলেন। আমার সব কথা শুনে একটুও রাগ করলেন না।

বরং হেসে হেসে বললেন,

– "থাক বাবা, অনেক হয়েছে। এখন তুমি তোমার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেও। তোমার বাবা-মা হয়তো তোমার জন্য চিন্তায় চিন্তায় পাগল হয়ে গেছেন।"

আমি বললাম,

– "তাহলে আজই রওনা দেই।"

– "সে কি। আজ কেন? আজ আমার এখানে বেড়ায়ে যাও। কাল ভোরের দিকে রওনা দিও।"

আমিও ওনার কথাই সায় দিলাম। সেই দিনটা কেটে গেল খুবই অস্থিরতার সাথে।

পরে দিন ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ পরিষ্কার করলাম বাড়ির কাছের একটা পুকুর থেকে। তারপর রবিউল ভাইয়ের স্ত্রী আমাকে খেতে দিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর রবিউল ভাই আমাকে ৭৫ টি টাকা দিয়ে বললেন,

– "আবার বেড়াতে এসো।"

– "ইনশাল্লাহ আবার আসব।"

আমাকে বিদায় জানাতে রবিউল ভাই, তার স্ত্রী, মা এবং আরও অনেকে এলেন। আমি যখন ওনাদের কাজ থেকে বিদায় নিলাম, তখন সবাই আমার জন্য দোয়া করলেন।

আমি শালবন দেখতে দেখতে বনের ভিতরের সরু রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। এমনিভাবে এক সময় রাজেন্দ্রপুর রেল স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে ট্রেন এলো। তখন কাউন্টার থেকে ১০ টাকা দিয়ে একটা টিকিট কিনে নিলাম। টিকিট টা অবশ্য ঢাকা যাবার। তারপর ট্রেনে চড়ে বসলাম।

18

বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা

অল্প কিছুক্ষণ পরে ট্রেন ছেড়ে দিল। এক সময় বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ট্রেন দ্রুতগতিতে শালবন অতিক্রম করে যাচ্ছে। আমার মনে হল, ট্রেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। শালবন গাছগুলো পিছনের দিকে দৌড়াচ্ছে। এক ঘন্টা পর ট্রেন কমলাপুর রেল স্টেশনে থামল। আমি ট্রেন থেকে নেমে লোকজনদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে করতে চলে গেলাম সদর ঘাটে। সদর ঘাটে এ দেশের বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার জন্য লঞ্চ থাকে। আমি খোঁজ করতে লাগলাম বরিশাল যাওয়ার জন্য কোন লঞ্চ পাওয়া যায় কিনা। লঞ্চ পেলাম ঠিকই, কিন্তু ছাড়তে তখনও অনেক দেরি। তখন দুপুর হয়ে গেছে। আমার পেট জানিয়ে দিল আমাকে এখন কি করতে হবে। পেটের কথাকে আমি সত্যি মনে করে চলে গেলাম একটা বেকারিতে। উদ্দেশ্য কিছু খাবার। বেকারি থেকে দুটো পাউরুটি কিনলাম। একটা সেখানে বসে খেয়ে নিলাম। আর একটা রাখলাম লঞ্চে বসে খাবার জন্য। তারপর লঞ্চের ছাদে উঠে বুড়িগঙ্গা নদীর অসংখ্য পালতোলা নৌকা দেখতে লাগলাম। দেখতে দেখতে এক সময় লঞ্চ ছাড়ার বেল বেজে উঠলো।

বিকেল পাঁচটা সময় লঞ্চ সদরঘাট থেকে ছেড়ে দিল। সে(লঞ্চ) তার ধীর গতি সম্পন্ন গতি নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। লঞ্চের একজন যাত্রীকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম আজ ২০ ই সেপ্টেম্বর। বাড়ি থেকে

বের হয়েছিলাম ১৭ ই জুলাই। হিসাব করে দেখলাম আমার ভ্রমণ করা হয়েছে ৬৫ দিন। সহজ হিসাবে বলতে গেলে বলা যায় ২ মাস ৫ দিন। কিন্তু জুলাই আর আগস্ট মাস ৩১ দিনের হওয়ায় আমার ভ্রমণ করা হয়েছে ২ মাস ৩ দিন। পার ভ্রমণ করতে দেয় হয়েছে ২৫০০ টাকা। না, ২৫০০ টাকা নয়। মাত্র ৯০০ টাকা। কারণ কি? কারণ তো আমার বলার অপেক্ষা রাখে না। আপনারাই তো তা জানেন।

ধীরে ধীরে রাত হয়ে এলো। লঞ্চ হয়ত এখন ঢাকা থেকে অনেক দূর এসে গেছে। অন্ধকারের দরুন বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। মাঝেমধ্যে তারার মত কতগুলো ছোট ছোট আলো দেখা যাচ্ছিল। এগুলো কতক্ষণ পর নিভে যাচ্ছিল, আবার জ্বলে উঠছিল।

লঞ্চের একটা পুলিশ এক সময় আমাকে জিজ্ঞেস করল,

– "যাবে কোথায়?"

– "বরিশাল।"

– "টিকিট নিয়েছ?"

– "না।"

– "তোমাকে টিকিট নিতে হবে না। আমাকে ২০ টাকা দাও, তোমাকে তোমার স্থানে নামিয়ে দেবনে।"

আমি খুব খুশি হয়ে ওনার কথায় রাজি হয়ে গেলাম। কারণ আমার মনে হয়েছিল বরিশাল যেতে নিশ্চয়ই ২০ টাকার বেশি দরকার। তাই ওনাকে(পুলিশকে) ২০টা টাকা সাথে সাথে দিয়ে দিলাম।

আমার গন্তব্য স্থান বরিশালেই। কিন্তু বরিশাল সদর নয়। শিকারপুর লঞ্চঘাট। শিকাগো লঞ্চ ঘাটটির পরের ঘাঁটির নাম উজিরপুর। আমার নানাবাড়ি হলো শিকারপুর আর দাদা বাড়ি হল উজিরপুর। ঠিক করলাম শিকারপুরেই নামবো।

সরকার নয়টার সময় লঞ্চ শিকারপুর ঘাটে থামল। আমি তড়িঘড়ি করে লঞ্চের সদর দরজার কাছে এলাম। দরজায় কয়েকটা লোককে দেখলাম, যাত্রীদের টিকিট চেক করে নিয়ে তারপর লঞ্চ থেকে নামতে দিচ্ছে। পুলিশটি

বলেছিল যে দরজার আশেপাশে থাকবে। কিন্তু অনেক খোঁজা-খুঁজির পরও তাকে পেলাম না। এদিকে আবার লঞ্চ ছেড়ে দেবার সময় হয়ে এসেছে। তাই বাধ্য হয়ে আস্তে আস্তে দরজার দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। দরজার কাছে যাওয়ার সাথে সাথেই একটা লোক সাথে সাথে বলে উঠলো,

- "এখানে নামবে?"

আমি উত্তর দিলাম,

- "হ্যাঁ।"

- "টিকিট কোথায়?"

- "টিকিট তো নাই।"

- "কোন জায়গা থেকে আইছ?"

- "ঢাকা।"

- "২০ টাকা দাও।"

আমি অবাক হয়ে গেলাম ঢাকার আসল ভাড়াই ২০ টাকা। তবে পুলিশটিকে ২০ টাকা দিতে গেলাম কেন। মনে পরল একটা প্রবাদ প্রবচনের কথা। কথাটি হল,

- "অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।"

আমি আর কি করবো। আমার কাছে তখন ২০টা টাকাই অবশিষ্ট ছিল। এদিকে আমাকে আবার এই স্টেশনে নামতেই হবে। তাই ২০ টাকা দিয়ে লঞ্চ থেকে নেমে পড়লাম।

তারপর নানা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আমার নানা বাড়ি বাহের চর গ্রামে। শিকারপুর হতে যার দূরত্ব মাত্র ১ মাইল। আমি হাঁটছি আর মনে মনে বলছি,

- "পরিচিত কোন লোকের দেখা যেন না পাই।"

কিন্তু তাই ঘটলো দেখলাম সামনে আমার পরিচিত একটা লোক। উনি আমার দিকেই আসছেন। সম্ভবত শিকারপুরে যাচ্ছেন কোন কাজে। আমি মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। তারপর ওনার সামনে দিয়ে মাথা নত করে চলে যেতে লাগলাম। কিন্তু তবুও আমাকে উনি চিনতে পারলেন।

চিনতে পেরে আনন্দ চিৎকার করে উঠলেন। তারপর ওনার সমস্ত কাজ বাদ দিয়ে আমাকে বাড়ি নিয়ে চললেন।

নানা বাড়ি কাছে যেতে যেতেই নানী আর খালাম্মারা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। নানা বেঁচে ছিলেন না। তিনি পাঁচ বছর আগে নিউমোনিয়ায় পরলোক গমন করেছে। নানি আর খালাম্মারা যখন আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন তখন আমার কি অবস্থা হয়েছিল তা তো আপনারা অনুভব করতে পারছেন। তারপর ওনারা কান্না থামিয়ে আমাকে নিয়ে চলেন বাড়ির ভিতরে। নানা বাড়ির উঠোন ছিল অনেক বড়। আমাকে দেখার জন্য এত লোক বড় হয়েছিল যে উঠোনও তাদের জায়গা করে দিতে পারল না। আমাকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে একটা খাটে শুয়ে দেয়া হলো। অনেকদিনএইরকম খাতে শুইনি। তাই শোয়ার সাথে সাথে খুবই আরাম বোধ করতে লাগলাম। সেদিনটা কেটে গেল খাটে শুয়ে শুয়েই। মাঝে মধ্যে খাবার দেওয়া হতো। তাও খাটে বসে খেতে হতো। কেউ আমাকে খাট থেকে উঠতে দিতে চাইতো না। দুপুর বেলা শুধু একবার উঠতে পেরেছিলাম গোসল করার জন্য। গোসল করার পর আবার বিছানায় শুতে হল।

দুইদিন পর বাবা খবর পেয়ে নানা বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন। তার একদিন পরও উনার সাথে মাগুরায় চলে এলাম। আমাকে প্রথম দেখে মা একটা কথাও বলতে পারলেন না। এমনকি একটু কাঁদলেনও না। শোকে দুঃখে হয়তো তিনি পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর আমাকে জড়িয়ে ধরে তিনি কাঁদতে শুরু করে দিলেন। তখন প্রতিজ্ঞা করলাম জীবনে মা-বাবাকে কষ্ট দেয়ার দেশ ভ্রমনে বের হবো না।

পরের দিন স্কুলের পোশাক পরে বই-খাতা নিয়ে স্কুলে উপস্থিত হলাম। সহপাঠীরা প্রথমে আমাকে দেখে একেবারে তাজ্জব বনে গেল। বিভিন্ন পিরিয়ডে এক একজন স্যার আসতে লাগলেন আর আমার ভ্রমণ কাহিনী শুনতে লাগলেন। আমি যথা সম্ভব সংক্ষেপে এই আমার ভ্রমণ কাহিনী ওনাদের কাছে বললাম। এমনিভাবে কেটে যেতে লাগলো পিরিয়ডের পর পিরিয়ড। কথা বলতে বলতে আমার মুখ ব্যথা হয়ে গেল। তবুও স্যারেরা

আমাকে ছাড়লেন না। এক সময় ক্লাস ছুটির ঘন্টা বেজে উঠলো। তখন ওনাদের হাত থেকে আমি রক্ষা পেলাম।

পরের দিন আমাদের স্কুলের শরীর চর্চা বিষয়ক আকরাম স্যার ও নার শরীরচর্চা পিরিয়ডে ছাত্রদের সামনে আমার ভ্রমণ কাহিনী বলতে বললে। আমি একরকম ভয়ে ভয়ে সবার সামনে উপস্থিত হলাম। তারপর কয়েকবার ঢোক গিলে আমার কাহিনী বলা শেষ করলাম।

আমি আর লিখতে পারছি না এজন্য আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আগে যদি জানতাম লেখা এত কষ্ট তাহলে এ পথে আর পা বাড়ালাম না। আপনাদের সকলকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে আজ এখানে শেষ করছি।

- ***মো মনিরুজ্জামান (মনির)***

২৯-৮-৯১

সমাপ্ত



About the Author

মোঃ মনিরুজ্জামান (মনির) ১৯৯৩ সালে মারা যান। মারা যাবার আগে তিনি এই বইটি লিখে যান। বইটি তিনি লেখা শেষ করেন ১৯৯১ সালে এবং বইটির কাহিনী ১৯৮৯ সালের।

You can connect with me on:

🌐 https://www.facebook.com/true.stories.of.our.life
 https://www.facebook.com/muhammad.rokonuzzaman